Contents

তাওহীদের ডাক

মার্চ-এপ্রিল ২০১৪

- ভ্রান্ত আক্বীদা : পর্ব-৪
- ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যুবকদের অবদান
- সোনামণি সংগঠনের বাস্তবায়ন পদ্ধতি
- শিরক ও তার ভয়াবহ পরিণতি
- পবিত্রতা অর্জনের শিষ্টাচার
- ইলমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ভারতীয় আগ্রাসন বিপর্যস্ত বাংলাদেশ

তাওহীদের ডাক

১৭তম সংখ্যা

মার্চ-এপ্রিল ২০১৪

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
সম্পাদক
মুযাফফর বিন মুহসিন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
নূরুল ইসলাম
নির্বাহী সম্পাদক
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
সহকারী সম্পাদক
বযলুর রহমান

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২
০১৭৪৪-৫৭৬৫৮৯
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www. tawheederdak.at-tahreek.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও ইমাম অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

⇨ **সম্পাদকীয়** ২

⇨ **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৩

⇨ **আক্বীদা** ৫
ভ্রান্ত আক্বীদা : পর্ব-৪
মুযাফফর বিন মুহসিন

⇨ **তাবলীগ** ১০
ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যুবকদের অবদান
আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস

⇨ **তানযীম** ১৪
সোনামণি সংগঠন : বাস্তবায়নের পদ্ধতি *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)*
মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান

⇨ **তারবিয়াত** ১৭
পবিত্রতা অর্জনের শিষ্টাচার
বযলুর রহমান

⇨ **তাজদীদে মিল্লাত** ২০
শিরক ও তার ভয়াবহ পরিণতি
ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর

⇨ **ধর্ম ও সমাজ** ২২
ইলমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

⇨ **চিন্তাধারা** ২৭
তাবলীগ জামায়াত ও বিশ্ব ইজতেমা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
আকরাম হোসাইন

⇨ **আহলেহাদীছ আন্দোলন** ৩৩
দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন
ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

⇨ **পূর্বসূরীদের লেখনী থেকে** ৩৫
আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রদত্ত ভাষণ

⇨ **সাময়িক প্রসঙ্গ** ৪০
ভারতীয় আগ্রাসন : বিপর্যস্ত বাংলাদেশ
মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

⇨ **পরশপাথর** ৪৪
ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তার ইসলাম গ্রহণ :
এক নাটকীয় কাহিনী

⇨ **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৪৮
প্রচলিত দ্বীন
মঈনুল হক মঈন

⇨ **ইতিহাস-ঐতিহ্য** ৫১
ইতিহাস কথা বলে : পর্ব-৩
মেহেদী আরীফ

⇨ **সংগঠন সংবাদ** ৫৩

⇨ **আইকিউ** ৫৬

Contents

সম্পাদকীয়

চাই তাক্বওয়াশীল দূরদর্শী কর্মী :

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে দক্ষ কর্মীর বিকল্প নেই। আর দক্ষতা, অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রধান শর্ত হল জ্ঞান। কারণ বিশুদ্ধ জ্ঞান সমাজ পরিবর্তনের মূল হাতিয়ার। এ জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রথম বাক্য ছিল 'পড়'। রাসূল (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন, 'সুতরাং জানুন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই' *(মুহাম্মাদ ১৯)*। নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াতের জন্য প্রথম শর্ত হল নির্ভেজাল ইলম। তাই ইমাম বুখারী (রহঃ) অধ্যায় রচনা করেছেন 'কথা বলা এবং কর্ম করার পূর্বেই জানা' *(বুখারী 'ইলম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১০)*।

বর্তমান সমাজে দু'ধরনের দাওয়াত প্রচলিত আছে। (১) ইসলামী দাওয়াত (২) জাহেলী দাওয়াত। ইসলামী দাওয়াত দু'ধরনের। (ক) শিরক ও বিদ'আত মিশ্রিত ত্বাগূতী দাওয়াত। (খ) শিরক ও বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী দাওয়াত। তবে এই ত্বাগূতী অপসংস্কৃতি ও নব্য জাহেলিয়াতের কুপ্রভাবেই সমাজ আজ বিপর্যস্ত। একশ্রেণীর আলেমের মাধ্যমে শিরক-বিদ'আত, যঈফ, জাল ও মিথ্যা কেচ্ছা-কাহিনীর দাওয়াত চালু আছে। ফলে নির্ভেজাল দাওয়াত আজ ভূ-লুণ্ঠিত। অন্যদিকে সমাজে রাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির নামে জাহেলী দাওয়াত চালু আছে। মূলতঃ ইসলামের শিকড় উচ্ছেদ করে জাহেলী সভ্যতা চাপিয়ে দেয়ার জন্য উক্ত দাওয়াতের আবির্ভাব ঘটেছে।

উক্ত অধঃপতিত সমাজকে সংস্কার করতে হলে প্রয়োজন ভেজালমুক্ত অহি ভিত্তিক দাওয়াত। আর এ জন্য প্রধান শর্ত হল, একদল নিবেদিতপ্রাণ দূরদর্শী তাক্বওয়াশীল কর্মী, যারা হবেন শারঈ জ্ঞানে পরিপক্ক; আন্তর্জাতিক জ্ঞানে হবেন অভিজ্ঞ। কারণ সমাজে প্রতিষ্ঠিত শিরক ও বিদ'আতী আমল কী কী, কত প্রকার, এর পরিণাম কী, সমাজে তার কুপ্রভাব কেমন, কোন্ পদ্ধতিতে এগুলোর প্রতিকার সম্ভব সে সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। অনুরূপভাবে জাহেলী মতবাদের অবস্থা, তার ভয়াবহ কুপ্রভাব, সেগুলোর দুর্বলতা কী সে বিষয়ে পূর্ণ ধারণা রাখা অপরিহার্য। অন্যথা আধুনিক জাহেলিয়াতকে মুকাবেলা করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ বলেন, 'আপনি আপনার রবের পথের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিন হিকমতপূর্ণ কথা, উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। আর তাদের সাথে বিতর্ক করুন সর্বাধিক উত্তম পদ্ধতিতে' *(নাহল ১২৫)*। উক্ত আয়াতে অভিজ্ঞ দাঈর গুণাবলী ফুটে উঠেছে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'বলুন! এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্‌র দিকে, জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১০৮)*। এছাড়াও বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছে দাঈদের দূরদর্শিতাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব নির্ভেজাল দাওয়াতের আহ্বায়ককে সর্বাগ্রে নিজের গুণাবলীর কথা নিরিবিলি ভাবতে হবে। এই আধুনিক চ্যালেঞ্জকে মুকাবেলার জন্য প্রয়োজন চরম অধ্যবসায় ও নিরন্তর সাধনা। ত্যাগের মহিমায় হতে হবে চিরন্তন পরাকাষ্ঠা। রাসূল (ছাঃ) জাহেলী সমাজ সম্পর্কে ভাবার জন্যই হেরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি মানব জাতির মুক্তির জন্য অহি নাযিলের পূর্বেই 'হিলফুল ফুযূল' গঠন করেছিলেন। বিশ্বমানবতাকে মুক্ত করার জন্য যাবতীয় অত্যাচার, নিপীড়ন, দুঃখ-কষ্ট, ক্ষুধা-কান্না সবই বরণ করে নিয়েছিলেন। তাই যতদিন সংগঠনের কর্মীদের মাঝে সমাজ সংস্কারের চরম স্পৃহা তৈরি না হবে, ততদিন দাওয়াতী কাজে সফলতা আসবে না। তাই অহি নাযিলের শুরুতেই রাসূল (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে চাদরাবৃত! উঠুন, অতঃপর ভীতি প্রদর্শন করুন এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন; অপবিত্রতা হতে দূরে থাকুন' *(মুদ্দাছছির ১-৫)*। উক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ করে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে কিভাবে তৈরি করেছেন।

দূরদর্শী ও তাক্বওয়াশীল কর্মীদের প্রথম শ্রেণীর মানুষ হলেন ছাহাবায়ে কেরাম। তারা ইলম, তাক্বওয়া, ধৈর্য, সাহস, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতিচ্ছবিতে ছিলেন তুলনাহীন। আলী বিন আবু ত্বালেব, মুছ'আব বিন উমায়ের, খুবায়েব, খাব্বাব বিন আরাত, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন তা বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করেছে। অতঃপর তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের অবদান অন্য রকম। তারপর মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের বিরামহীন শ্রম পৃথিবীকে চমকে দিয়েছে। এই ধারাবাহিকতা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সবৈশিষ্ট্যে চলমান থাকবে। প্রথমতঃ তারা কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে জিহাদের ময়দানে সংগ্রাম করেছেন জান্নাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষায়। দ্বিতীয়তঃ খারেজী, শী'আ, মুরজিয়া ও ক্বাদারিয়াদের সৃষ্ট ভ্রান্ত আক্বীদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে তিন খলীফাসহ অনেক ছাহাবীকে জীবন দিতে হয়েছে। তবুও ঐ পথভ্রষ্টদের সাথে আপোস করেননি। তৃতীয়তঃ ছহীহ হাদীছ সমূহ পৃথক করতে গিয়ে মুহাদ্দিছগণ সংগ্রাম করেছেন যঈফ, জাল ও বানোয়াট হাদীছের বিরুদ্ধে। তাতে তারা সরকারের পোষা গোলাম পেটপূজারি বিদ'আতী আলেমদের তোপের মুখে পড়েন। কিন্তু তারা তা পরওয়া করেননি। চতুর্থতঃ দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তারা মুসলিম ভূখণ্ড রক্ষায় চিরন্তন জিহাদ পরিচালনা করেছেন। একশ্রেণীর তাক্বওয়াশীল দূরদর্শী দাঈদের মাধ্যমেই যুগ যুগ ধরে এই ঐতিহাসিক আন্দোলন পরিচালিত হয়ে আসছে।

মূলতঃ নির্ভেজাল তাওহীদী আন্দোলন যেমন ভীত কাপুরুষদের জন্য নয়, তেমনি মেধাহীন, মাথামোটা, লক্ষ্যভ্রষ্ট, জরাগ্রস্ত, প্রাণহীন বাচালদের জন্যও নয়; বরং আহলেহাদীছ আন্দোলন হল নিবেদিতপ্রাণ আপোসহীন সংগ্রামী একশ্রেণীর সাহসী কর্মীদের জন্য এবং তাক্বওয়াশীল দূরদর্শী অভিজ্ঞতালব্ধ একশ্রেণীর প্রশিক্ষিত তাজাপ্রাণ তরুণদের জন্য। যারা হবেন পূর্বসুরীদের যোগ্য উত্তরসুরী।

আগামী ১১ এপ্রিল রোজ শুক্রবার রাজশাহী নওদাপাড়ায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কর্মী সম্মেলন ২০১৪ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। এ সম্মেলন উপলক্ষে কর্মীদের কাছে প্রত্যাশা এমনটিই। উক্ত গুণ সম্পন্ন কর্মী সমাজকে উপহার দিতে পারলে স্থায়ী সাফল্য সুনিশ্চিত। আমরা তরুণ ছাত্র সমাজকে এই তাওহীদী কাফেলায় স্বাগত জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন! কর্মী সম্মেলন ২০১৪-কে সফলভাবে সম্পন্ন করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

দাওয়াতের গুরুত্ব

আল-কুরআনুল কারীম :

১- قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحانَ اللَّهِ وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

'বলুন! ইহাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্‌র পথে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ মহা পবিত্র আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

২- ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

'আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে হেকমত ও উপদেশ দ্বারা আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক করুন। তাঁর পথ থেকে কে পথভ্রষ্ট হয় সে ব্যাপারে আপনার প্রতিপালক অধিক জ্ঞাত এবং কে হেদায়াতপ্রাপ্ত তাও তিনি সবিশেষ অবহিত' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

৩- وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آياتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلى رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

'আপনার নিকট আল্লাহ্‌র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা যেন আপনাকে সেগুলো থেকে বিমুখ না করে। আপনি প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৭)*।

৪- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً - وَداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً

'হে নবী! আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে'। 'আল্লাহ্‌র অনুমতিতে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে' *(আহযাব ৩৩/৪৫-৪৬)*।

৫- وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صالِحاً وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

'ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম কথা কার, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত' *(ফুছছিলাত ৪১/৩৩)*।

৬- فَلِذلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

'অতএব আপনি তার দিকে আহ্বান করুন ও তাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকুন যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন এবং তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবেন না। বল, আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে। আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের ও তোমাদের কর্ম তোমাদের। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহই আমাদেরকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে' *(শূরা ৪২/১৫)*।

৭- يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ.

'হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি হ'তে রক্ষা করবেন' *(আহক্বাফ ৪৬/৩১)*।

৮- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

'হে ঈমানদারগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিবে। জেনে রাখ যে, আল্লাহ সম্মুখ ও তার অন্তরের মধ্যবর্তী হয়ে থাকেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে' *(আনফাল ৮/২৪)*।

হাদীছে নববী থেকে :

৯- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِى أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন মু'আয (রাঃ)- কে ইয়ামানে পাঠালেন, তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং তাদেরকে প্রথম আহ্বান করবে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার একত্বকে মেনে নেয়। যদি তারা তা স্বীকার করে তবে তাদেরকে বলবে, আল্লাহ তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতকে ফরয করেছেন। তারা যদি ছালাত আদায় করে তবে তাদেরকে জানাবে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা ধনীদের নিকট থেকে আদায় করা হবে এবং গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে। তারা যদি এটা মেনে নেয় তাহলে তাদেগর নিকট থেকে তা গ্রহণ করবে। তবে মানুষের সম্পদের মূল্যের ব্যাপারে সাবধাণ থাকবে *(বুখারী হা/৭৩৭২, 'তাওহীদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১)*।

১০- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَالَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার আমরা মসজিদে নববীতে বসে ছিলাম। তখন নবী করীম (ছাঃ) বের হয়ে বললেন, তোমরা ইহুদীদের কাছে চল। আমরা চললাম এবং তাদের পাঠক্রমে পৌঁছলাম। রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে নিরাপত্তা পাবে। জেনে রাখ! পৃথিবী আল্লাহ তাঁর রাসূলের। আমি ইচ্ছা করছি তোমাদেরকে এই দেশে হতে নির্বাসিত করব। যদি কেউ তার মালের বিনিময়ে কিছু পায়, তবে সে যেন তা বিক্রি করে। জেনে রাখ! পৃথিবী আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের *(বুখারী হা/৩১৬৭)*।

১১- عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.

জুনাদা ইবনু উমাইয়া (রাঃ) বলেন, আমরা উবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। আমরা বললাম, আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করুন! আমাদের একটি হাদীছ বর্ণনা করুন, যা আপনি

রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে শুনেছেন এবং আল্লাহ আমাদেরকে উপকার করবেন। তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) একদা আমাদের ডাকলেন এবং তাঁর নিকট আনুগত্যের বায়‘আত করলাম। তিনি যে সমস্ত বিষয়ে আমদের বায়‘আত নিলেন তাহল, সুখে-দুঃখে, দুর্দিনে-সুদিনে, স্বচ্ছলতা-অস্বচ্ছলতায়, এমনকি কোন ব্যক্তিকে আমাদের উপর প্রাধান্য দেয়া হলেও আমরা নেতার আনুগত্য করব এবং কাউকে দায়িত্ব অর্পণ করা হলে আমরা তাতে বাধা দেব না। তিনি আরো বলেন, কিন্তু তোমরা যদি তাকে প্রকাশ্য কুফরীতে লিপ্ত দেখ, স্পষ্ট প্রমাণ সহকারে (তখন কোন আনুগত্য নেই) *(মুসলিম হা/৪৮৭৭)*।

১২- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদের এমন বিষয় সম্পর্কে বলে দিব না, যে কারণে আল্লাহ তোমাদের গুনাহ সমূহ মুছে দিবেন এবং তোমাদের মর্যাদাকে সমুন্নত করবেন? ছাহাবীরা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। তখন তিনি বললেন কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণরূপে ওযূ করা, বেশী বেশী মসজিদের দিকে যাওয়া এবং এক ছালাত শেষ করার পর অপর ছালাতের অপেক্ষায় থাকা। আর এটিই ‘রিবাত’ *(মুসলিম হা/৬১০; মিশকাত হা/২৮২)*।

১৩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا وَيَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا وَأَنْ يُصَلُّوا صَلاَتَنَا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা‘বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমাদের কিবলাকে কিবলা মনে করে এবং আহার করবে আমাদের যবেহকৃত পশু, আমাদের সাথে ছালাত আদায় করে। এগুলো করলে তাদের জান ও মাল আমাদের উপর হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলামের অধিকারের বিষয়টি ভিন্ন। মুসলিমদের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা তারাও পাবে এবং মুসলিমদের উপর অর্পিত দায়-দায়িত্ব তাদের উপরেও বর্তাবে *(তিরমিযী হা/২৬০৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০৩, সনদ ছহীহ)*।

١٤–عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াতও জানা থাকলে তোমরা তা পৌঁছিয়ে দাও। আর বনী ইসরাঈলের কাহিনী বর্ণনা কর তাতে দোষ নেই। তবে যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করল সে তার নিজের স্থান জাহান্নামে করে নিল *(বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮)*।

١٥–عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّى أُبْدِعَ بِى فَاحْمِلْنِى فَقَالَ مَا عِنْدِى فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

আবু মাসঊদ আল-আনছারী (রাঃ) বলেন, জনৈক এক লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার সওয়ারী ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে একটি সওয়ারী দান করুন। তিনি বললেন, সওয়ারী আমার কাছে নেই। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি তাকে এমন লোকের কথা বলে দিতে পারি, যে তাকে সওয়ারীর পশু দিতে পারবে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি কল্যাণের দিকে পথ দেখায় তার জন্য কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ পুরস্কার রয়েছে *(মুসলিম হা/৫০০৭; মিশকাত হা/২০৯)*।

١٦– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি হেদায়াতের দিকে আহ্বান করবে তার জন্য তার অনুসারী ব্যক্তির সমপরিমাণ নেকী রয়েছে কিন্তু তার নেকী থেকে বিন্দু পরিমাণ হ্রাস পাবে না। যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে তার জন্য তার অনুসারী ব্যক্তির সমপরিমাণ পাপ রয়েছে কিন্তু তার পাপ থেকে বিন্দু পরিমাণ হ্রাস পাবে না। *(মুসলিম হা/৬৯৮০; মিশকাত হা/১৫৮)*।

মনীষীদের বক্তব্য থেকে :

১. হাসান বাছরী (রহঃ) নিম্নোক্ত আয়াত ‘কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা, যে আল্লাহ্র দিকে মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে আমি তো মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত’ *(ফুছ্ছিলাত ৪১/৩৩)* তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর বললেন, এই ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র, আল্লাহ্র অলী, একনিষ্ঠ বন্ধু, আল্লাহ্র উত্তম বস্তু, পৃথিবীবাসীর মধ্যে আল্লাহ্র নিকট তিনি সর্বাধিক প্রিয়। আল্লাহ তার দু‘আ কবুল করেন। আল্লাহ যা কবুল করেন তার দিকেই তিনি মানুষকে দাওয়াত দেন এবং তআর আলোকেই আমলে ছালেহ করেন। আর বলেন, আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। তিনিই আল্লাহ কর্তৃক দায়িত্বশীল *(তাফসীর ইবনু কাছীর, ৪/১০১ পৃঃ)*।

২. আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) আল্লাহ্র বাণী, বলুন! ইহাই আমার পথ...*(ইউসুফ ১২/১০৮)* উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন এই রাস্তায় আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করেন। অতঃপর যিনি আল্লাহ্র দিকে ডাকেন তিনি যেন রাসূলের পথে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে তাঁর অনুসারী হয়ে ডাকেন। আর যিনি এটা ছাড়া মানুষকে আহ্বান করলেন তিনি এই রাস্তায় জাগ্রত জ্ঞান সহকারে তাঁর অনুসারী না হয়ে আহ্বান করলেন। আল্লাহ্র দিকে আহ্বান নবী ও তাদের অনুসারীদের কাজ এবং রাসূলদের উম্মতদের মধ্যে তাদের অনুসারীদের কাজ। মানুষেরা তাদের অনুসরণ করে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলকে আরো নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁর নিকটে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা যেন পৌঁছে দেন। আল্লাহ তাঁর সংরক্ষণ ও মানুষের বাধা থেকে মুক্ত রাখবেন। আর তাঁর উম্মতদের মধ্যে যারা উক্ত কাজ করবে তাদেরকেও তিনি হেফাযত করবেন ও দ্বীনের উপর অটল থাকা ও দাওয়াতী কাজের বাধা থেকে প্রচ্ছন্ন রাখবেন। রাসূল (ছাঃ) একটি আয়াতও জানা থাকলে তা প্রচারের কথা নির্দেশ দিয়েছেন *(ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়া, জালা-উল আফহাম (কুয়েত : দারুল আরূবা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৭ হিঃ/১৯৮৭ খ্রিঃ), পৃঃ ৪১৫)*।

সারবস্তু

১. আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়ার পুরস্কার জান্নাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

২. দাওয়াত মানুষকে কল্যাণ ও হেদায়াতের দিকে আহ্বান করে।

৩. দ্বীনের প্রতি আহ্বান বান্দার সংশোধন ও দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রমাণ।

৪. আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্র নিকটবর্তী হয়ে যায় এবং জান্নাত লাভে ধন্য হয়।

৫. একজন দাঈর জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে, যা কয়েকগুণে প্রবৃদ্ধি লাভ করে এবং তাদের জন্যও, যারা তার আহ্বানে সাড়া দেয়।

ভ্রান্ত আক্বীদা : পর্ব-৪

-মুযাফফর বিন মুহসিন

(১০) যিনিই আল্লাহ তিনিই মুহাম্মাদ (নাঊযুবিল্লাহ)।

একশ্রেণীর ভণ্ড ছূফীরা উক্ত কুফুরী আক্বীদা পোষণ করে থাকে। তারা কবিতার সুরে সুরে বলে, 'আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা; 'আহমাদ' 'আহাদ' হলে তবে যায় জানা। মীমের ঐ পর্দাটিরে উঠিয়ে দেখরে মন, দেখবি সেথায় বিরাজ করে 'আহাদ' নিরঞ্জন' (নাঊযুবিল্লাহ)। এছাড়া তারা আরো বলে থাকে, 'ওহ্ জো মুস্তাবী আরশ থা খোদা হো কর, উতার পাড়া হ্যায় মদীনা মেঁ মুছত্বফা হো কর'। অর্থাৎ 'আরশের অধিপতি আল্লাহ ছিলেন যিনি, মুছত্বফা রূপে মদীনায় অবতীর্ণ হন তিনি' (নাঊযুবিল্লাহ)।[1] তাফসীরে হাক্কীর মধ্যে বলা হয়েছে,

جَبَلٌ بِمَكَّةَ كَانَ عَلَيْهِ عَرْشُ الرَّحْمَنِ حِيْنَ لاَ لَيْلٌ وَلاَ نَهَارٌ إِشَارَةً بِالْجَبَلِ إِلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِعَرْشِ الرَّحْمَنِ إِلَى قَلْبِهِ كَمَا وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللهِ.

'মক্কায় এমন একটি পাহাড় রয়েছে, যার উপর আল্লাহর আরশ রয়েছে। যেখানে রাত ও দিন কিছুই হয় না। উক্ত পাহাড় দ্বারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শরীর বুঝানো হয়েছে। আর আরশ দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর অন্তরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, মুমিনের অন্তর আল্লাহর আরশ'।[2] সুতরাং যিনি আল্লাহ তিনিই মুহাম্মাদ। উক্ত আক্বীদা থেকেই পাশাপাশি 'আল্লাহু' 'মুহাম্মাদ' লেখার প্রচলন হয়েছে।

পর্যালোচনা :

বিভিন্ন যুক্তি ও কৌশলে আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে একাকার করা হয়েছে। তারা খুব স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি আর স্রষ্টাকে এক করেছে। এ ধরনের কুফুরী কথা বলতে তাদের বুক একটুকুও কাঁপে না। উল্লেখ্য যে, পরে হাদীছের নামে দলীল হিসাবে যে কথাটি বর্ণনা করা হয়েছে তাও মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। লেখক উক্ত মিথ্যা দাবীর পরে 'ফানাফিল্লাহর' পক্ষে অনেক আলোচনা করেছেন। এভাবেই শিরকী আক্বীদা মানুষের মাঝে প্রচার করা হচ্ছে। তারা কালেমায়ে শাহাদাত মুখে উচ্চারণ করার পর কিভাবে আবদ এবং মা'বূদকে, বান্দা এবং আল্লাহকে এক হিসাবে মনে করছে তা বুঝা বড় ভার!

যতগুলো নোংরা বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত আছে তার মধ্যে এটি সবচেয়ে জঘন্য। ভ্রান্ত আক্বীদা জানা সত্ত্বেও যদি কেউ উক্ত বিশ্বাস করে তবে সে শিরকে আকবারে নিমজ্জিত হবে, যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে এবং এ অবস্থায় মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

(১১) রাসূল (ছাঃ) যেকোন স্থানে হাযির হতে পারেন :

বিদ'আতী মীলাদের অনুষ্ঠানকে জমজমাট রাখার জন্য উক্ত মিথ্যা আক্বীদা সৃষ্টি করা হয়েছে। অনেক স্থানে মঞ্চে একটি চেয়ারকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়। যাতে এই খালি চেয়ারে রাসূল (ছাঃ) এসে বসতে পারেন। তারা সূরা তওবার শেষ আয়াত দুইটি পাঠ করে অনুষ্ঠান শুরু করে *(তওবা ১২৮-১২৯)*। আর তখনই রাসূল (ছাঃ)-কে স্বাগত জানানোর জন্য সকলে মিলে দাঁড়িয়ে যায়। মূলতঃ বিদ'আতী কিয়াম প্রথার আবিষ্কার এভাবেই হয়েছে। তাদের ধারণা শুধু নবীগণ নয়, মৃত অলীরাও যেখানে ইচ্ছা সেখানে হাযির হতে পারেন। যেমন তাবলীগ জামায়াতের লোকদের আক্বীদা :

(ক) দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা নানোতুবী মৃত্যু বরণের বহু দিন পর এক সমস্যা সমাধানের জন্য মাদরাসায় আগমন করেন। যেমন- এক সময় মাওলানা আহমাদ হাসান আমরুহী এবং ফখরুল হাসান গাঙ্গোহীর মাঝে মনোমালিন্য হয়। কিন্তু মাওলানা মাহমূদুল হাসান (১২৩৮-১৩৩৮ হিঃ) নিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও এক পক্ষের দিকে ঝুঁকে যান। তখন মাওলানা রফীউদ্দীন মাওলানা মাহমূদুল হাসানকে ডেকে পাঠান। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই তিনি বলছেন, আগে তুমি আমার কাপড় দেখ। শীতকাল হওয়া সত্ত্বেও তার সমস্ত কাপড় ভিজে গেছে। রফীউদ্দীন বললেন, মাওলানা নানোতুবী জাসাদে আনছারীতে এখনই আমার নিকট এসেছিলেন। তাই ঘামে আমার কাপড় ভিজে গেছে। তিনি আমাকে বলে গেলেন, তুমি মাহমূদুল হাসানকে বলে দাও, সে যেন ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়। আমি শুধু এটা বলার জন্যই এসেছি।[3]

(খ) তাবলীগ জামায়াতের আরেক প্রবক্তা রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী (মৃঃ ১৯০৮ খৃঃ) তার 'আল-বারাহী আল-ক্বাতিয়া' গ্রন্থে বলেন, আমার মনে হয়, আল্লাহর নিকট দেওবন্দ মাদরাসা প্রশংসিত আসন পেয়েছে। কারণ অসংখ্য আলেম এখান থেকে পাশ করেছেন এবং জনসাধারণের অনেক কল্যাণ সাধন করেছে। পরবর্তীকালে এক মহান ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর দর্শন লাভ করে আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছিলেন। সে সময়ে তিনি দেখেছেন যে, রাসূল (ছাঃ) উর্দু ভাষায় কথা বলছেন। তখন ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি একজন আরবী লোক, কিভাবে এই ভাষা জানলেন? রাসূল (ছাঃ) উত্তরে বললেন, 'যখন থেকে দেওবন্দের আলেমদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে, তখন থেকেই আমি এই ভাষা জানি'। গাঙ্গোহী আরো বলেন, এ থেকে আমরা এই মাদরাসার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারি।[4]

পর্যালোচনা :

এটা কুফুরী আক্বীদা। রাসূল (ছাঃ) মারা গেছেন। তিনি আর কখনো দুনিয়াতে আসতে পারবেন না। কেউ ইচ্ছা করলেও আসতে পারবে না। আল্লাহ বলেন,

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ- لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ.

'যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আবার ফেরত পাঠান, যাতে আমি সৎ আমল করতে পারি, যা আমি পূর্বে করিনি; কখনোই না। এটা তার একটি কথা মাত্র; তাদের সামনে বারযাখ থাকবে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত' *(সূরা মুমিনূন ৯৯-১০০)*। অন্য আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُوْنَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ

'অতঃপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যু বরণ করবে। তারপর তোমরা ক্বিয়ামত দিবসে অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে' *(মুমিনূন ১৫-১৬)*।

---

১. আল্লামা ইহসান এলাহী যহীর, ব্রেলভী মাসলাক কে আক্বাঈদ (ইউপি, মৌনাতভঞ্জন : ইদারা দাওয়াতুল ইসলাম, জানুয়ারী ২০১৩), পৃঃ ৯৯।

২. তাফসীরে হাক্কী ৪/৯৮ পৃঃ, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নামে বর্ণিত।

৩. মাওঃ আশরাফ আলী থানভী, আরোহায়ে ছালাছা, হিকায়েতে আওলিয়া (দেওবন্দ : কুতুবখানা নঈমীয়া), পৃঃ ২৬১; হিকায়েত নং-২৪৭।

৪. আল-বারাহী আল-ক্বাতিয়া, পৃঃ ৩০; গৃহীত : সাজিদ আব্দুল কাইয়ূম, তাবলীগ জামা'আত ও দেওবন্দীগণ, পৃঃ ২২১।

দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীতে একই সময়ে অসংখ্য স্থানে এই বিদ'আতী মীলাদ হয়। কোন স্থানে কখন মীলাদ হচ্ছে তা রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষে জানার কথা নয়। কারণ এটা গায়েবের বিষয়। আর তিনি গায়েব জানেন না। রাসূল (ছাঃ) গায়েব জানেন এই দাবী করে তারা তাঁর উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। তৃতীয়তঃ হঠাৎ উঠে দাঁড়ানো যে সীমাহীন মূর্খতা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা হিন্দুদের পূজাকে ভোগ দেয়ার মত। সাধারণ মুসলিমদেরকে একটু চিন্তা করার অনুরোধ করছি।

(১২) নবী-রাসূলগণের চেয়ে ছূফীরাই শ্রেষ্ঠ :

যারা ছূফীবাদে বিশ্বাসী তারা রাসূল (ছাঃ)-এর চেয়ে কথিত ওলীদেরকে বড় মনে করে। স্বয়ং বায়েযীদ বুস্তামী বলেন, لِوَائِيْ أَرْفَعُ مِنْ لِوَاءِ مُحَمَّدٍ 'আমার পতাকা (মর্যাদা) মুহাম্মাদের পতাকার চেয়ে অধিকতর উঁচু'।[৫]

পর্যালোচনা :

তথাকথিত ছূফীরা যখন আল্লাহ বলে দাবী করতে ইতস্ততবোধ করেনি, তখন উক্ত দাবী করা তাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এদেশের ছূফী ভক্ত লোকেরাও ছূফীদেরকে সেভাবেই মূল্যায়ন করে থাকে। তাই রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের আদর্শ ছেড়ে তারা ছূফীদের আদর্শকেই মূল্যায়ন করে। তাদের প্রণীত তরীকা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে। অথচ তারা জানে না যে, এ ধরনের বিশ্বাস করলে ঈমান থাকবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'নিশ্চয় রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে' *(আহযাব ২১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার হাতে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রাণ রয়েছে, তাঁর কসম করে বলছি, যদি আজ মূসা (আঃ) তোমাদের নিকটে আবির্ভূত হন আর তোমরা তার অনুসরণ কর এবং আমাকে পরিত্যাগ কর, তবুও তোমরা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আজ মূসা (আঃ) যদি বেঁচে থাকতেন আর আমার নবুওঅত পেতেন, তবে তিনিও আমার অনুসরণ করতেন'।[৬]

অতএব ঈমান বিধ্বংসী ছূফী আক্বীদা থেকে সাবধান! যারা রাসূল (ছাঃ)-কে বাদ দিয়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে আদর্শের ধারক হিসাবে গ্রহণ করবে তার জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا. 'হেদায়াত প্রকাশিত হওয়ার পরও যে ব্যক্তি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মুমিনদের রাস্তার বিপরীত পথে চলবে, তাকে আমি সেদিকেই পরিচালিত করব, সে যেদিকে ফিরে যেতে চায় এবং আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর এটা কতই না নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন স্থল' *(নিসা ১১৫)*।

(১৩) রাসূল (ছাঃ) ও কথিত মৃত অলীদেরকে মাধ্যম করে দু'আ করা।

পর্যালোচনা :

এটা পরিষ্কার শিরকী আক্বীদা। যদিও অসংখ্য মুসলিম রাসূল (ছাঃ)-কে অসীলা করে দু'আ করে থাকে। রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালে তা বুঝা যায়। এমনকি অনেকে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে এবং বিভিন্ন বিষয় আবদার করে থাকে। এটা শিরকে আকবার। এদের হজ্জ-ওমরা কোনই কাজে আসবে না। বরং জীবনে যত নেকীর কাজ করেছে সবই নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'তারা যদি শিরক করে তবে তাদের যাবতীয় আমল বরবাদ হয়ে যাবে' *(আন'আম ৮৮)*।

৫. মাওসূ'আতুর রাদ্দি আলাছ ছূফিয়াহ ৬৮/৭১ পৃঃ।
৬. দারেমী হা/৪৪৩; সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৯৪, পৃঃ ৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫।

শরী'আতে কেবল তিন ধরনের অসীলা বৈধ। (ক) নিজের কৃত সৎ আমলকে অসীলা করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা *(মায়েদাহ ৩৫)*।[৭] (খ) আল্লাহর গুণবাচক নাম সমূহ দ্বারা *(আ'রাফ ১৮০)*। (গ) জীবিত তাক্বওয়াশীল ব্যক্তিকে অসীলা করে চাওয়া।[৮] এছাড়া অন্য যেকোন অসীলা হারাম। বিশেষ করে মৃত ব্যক্তিকে অসীলা করে দু'আ করা জাহেলী যুগের মক্কার মুশরিকদের আদর্শ। যারা এ ধরনের বিশ্বাস করে তাদের জানা উচিত যে, রাসূল (ছাঃ) যদি তাঁর মৃত্যুর পর ছাহাবীদের কোন উপকার করতে না পারেন, তবে পৃথিবীর আর কোন ব্যক্তি আছে, সে মরার পর দুনিয়ার মানুষের উপকার করবে?

(১৪) রাসূল (ছাঃ) কবর থেকে সালামের উত্তর দেন। কখনো হাত বের করে দেন।

বহু মানুষের মাঝে উক্ত আক্বীদা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে যারা ছূফী তরীকায় বিশ্বাসী তাদের মাঝে। তাবলীগ জামায়াতের লোকেরা যেহেতু উক্ত তরীকায় বিশ্বাসী তাই ফাযায়েলে আমল বইয়ে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। (ক) ইবরাহীম বিন শাইবান বলেন, আমি হজ্জের পর যিয়ারতের জন্য মদীনায় উপস্থিত হলাম এবং কবরের নিকট গিয়ে সালাম দিলে তিনি হুজরা শরীফের ভিতর থেকে 'ওয়া আলাইকাস সালাম' বলে জবাব দেন। আমি তার সালামের উত্তর শুনতে পেলাম।[৯]

(খ) আহমাদ রেফাঈ নামক জনৈক ব্যক্তি ৫৫৫ হিজরী সালে হজ্জ শেষ করে নবী করীম (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় যান। অতঃপর রওযার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দু'টি পঙক্তি পাঠ করেন। 'দূর থেকে আমি আমার রূহকে রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিতাম। সে আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে রওযায় চুম্বন করত। আজ আমি সশরীরে উপস্থিত হয়েছি। সুতরাং হে রাসূল (ছাঃ)! আপনার হাত মুবারক বাড়িয়ে দিন, আমি যেন আমার ঠোঁট দ্বারা চুম্বন করে তৃপ্তি লাভ করতে পারি'। উক্ত কবিতা পড়ার সাথে সাথে কবর হতে রাসূল (ছাঃ)-এর হাত বের হয়ে আসে। আর রেফাঈ তাতে চুম্বন করে ধন্য হন। বলা হয় যে, সে সময় মসজিদে নববীতে ৯০ হাযার লোকের সমাগম ছিল। সকলেই বিদ্যুতের মত হাত মুবারকের চমক দেখতে পেল। তাদের মধ্যে মাহবূবে সুবহানী আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রহঃ)ও ছিলেন।[১০]

পর্যালোচনা :

এটাও কুফুরী আক্বীদা। কারণ মৃত ব্যক্তি দুনিয়ার মানুষের কোন কথা শুনতে পায় না। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আপনি মৃতকে শুনাতে পারবেন না; বধিরকেও আহ্বান শুনাতে পারবেন না, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়' *(নামল ৮০; রূম ৫২)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ.

'জীবিত আর মৃত এক সমান নয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান। যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে আপনি শুনাতে পারবেন না' *(ফাত্বির ২২)*। অন্যের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। সে জন্য ছাহাবায়ে কেরাম কখনো নবী করীম (ছাঃ)-এর কবরের কাছে গিয়ে কোন কিছু আবদার করেননি।

৭. বুখারী হা/৫৯৭৪, 'আদব' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫; মুসলিম হা/৭১২৫; মিশকাত হা/৪৯৩৮।
৮. বুখারী হা/১০১০, ১/১৩৭ পৃঃ।
৯. ফাজায়েলে দুরূদ, পৃঃ ৩৩; উর্দূ, পৃঃ ১৯।
১০. ফাজায়েলে হজ্ব (বাংলা, তাবলীগী কুতুবখানা প্রকাশিত, এপ্রিল-২০০৯), পৃঃ ১৪০-১৪১; (উর্দূ) ফাযায়েলে আ'মাল ২য় খণ্ড, ফাযায়েল হজ্জ অংশ (দেওবন্দ : দারুল কিতাব প্রকাশিত), পৃঃ ১৬৬।

(১৫) ভণ্ড পীরের কারামত দাবী করা এবং ভবিষ্যতের কথা ব্যক্ত করা।

পর্যালোচনা :

কারামাতে আওলিয়ায় বিশ্বাস করা ছহীহ আক্বীদার অংশ, যা প্রকাশিত হয় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি অগ্রীম কিছু জানাতে পারেন না। আর ভণ্ড পীরেরা যে কারামতের দাবী করে থাকে তা ইবলীস শয়তান কর্তৃক সাজানো মিথ্যা নাটক। মূলতঃ তা শয়তানরূপী নগ্ন মেয়ে জিনের মাধ্যমে ঘটিয়ে থাকে। তাই এই ভণ্ডরা ইবলীস শয়তানের নির্বাচন করা দুনিয়াবী এজেন্ট। যেমন নিম্নের হাদীছটি লক্ষণীয়-

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ سَأَلَ أُنَاسٌ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَىْءٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَ بِالشَّىْءِ يَكُوْنُ حَقًّا قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّىُّ فَيُقَرْقِرُهَا فِىْ أُذُنِ وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُوْنَ فِيْهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে একদা লোকেরা গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি উত্তরে বললেন, নিশ্চয় তারা কিছু করতে পারে না। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তারা যা বর্ণনা করে তা কখনো সত্যও হয়। তিনি বললেন, উক্ত সত্য কথা মেয়ে জিন ছুঁ মেরে নিয়ে আসে এবং তার ভণ্ড অলীর কানে বলে দেয়, যেভাবে মুরগী করকর করে। অতঃপর তারা তার সাথে একশ'র বেশী মিথ্যা কথা মিশ্রিত করে।[১১] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمَلاَئِكَةُ تَتَحَدَّثُ فِى الْعَنَانِ وَالْعَنَانُ الْغَمَامُ بِالأَمْرِ يَكُوْنُ فِى الأَرْضِ فَتَسْمَعُ الشَّيَاطِيْنُ الْكَلِمَةَ فَتَقُرُّهَا فِىْ أُذُنِ الْكَاهِنِ كَمَا تُقَرُّ الْقَارُوْرَةُ فَيَزِيْدُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ.

আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, দুনিয়ায় ঘটবে এমন বিষয় নিয়ে ফেরেশতামণ্ডলী মেঘের মাঝে আলোচনা করেন। তখন কোন কথা শয়তানরা শুনে ফেলে। অতঃপর তা গণকের কানে হুবহু বর্ণনা করে করে। যেভাবে কাঁচকে স্বচ্ছ করা হয়। অতঃপর তারা ঐ কথার সাথে আরো একশ' মিথ্যা কথা যোগ দেয়।[১২] অন্য হাদীছে এসেছে, শয়তানরা একজনের উপর আরেকজন উঠে। এভাবে আসমানের কাছাকাছি গিয়ে উক্ত কথা শ্রবণ করে এবং উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।[১৩]

অতএব ভণ্ড ফকীরেরা যে ইবলীস শয়তানের স্পেশাল এজেন্ট, তা উক্ত হাদীছগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাই ঈমান বাঁচানোর স্বার্থেই তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে।

(১৬) ওয়াহদাতুল ওজূদ বা সবকিছুতে আল্লাহ্র উপস্থিতিকে বিশ্বাস করা।

সবকিছুর মধ্যে আল্লাহর বিলীন হওয়াকে 'ওয়াহদাতুল ওজূদ' বলে। একশ্রেণীর লোকেরা পৃথিবীর সবকিছুকেই এক আল্লাহর অংশ মনে করে (নাঊযুবিল্লাহ)। সবকিছুতেই আল্লাহ্র উপস্থিতি রয়েছে। তাই সবই আল্লাহ। আল্লাহ আরশে নন, বরং সর্বত্র ও সবকিছুতে বিরাজমান। ছূফীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য করে না। বরং কোন ব্যক্তি যখন উক্ত মর্যাদা অর্জন করে তখন তাকে আর শরী'আতের বিধি-বিধান পালন করা লাগে না। কারণ সে আল্লাহর মাঝে বিলীন হয়ে যায়। তাদের বক্তব্য হল, فَإِنَّ مِنَ الصُّوْفِيَّةِ مَنْ يَقُوْلُ إِنَّ مَنْ عَرَفَ اللهَ تَعَالَى سَقَطَتْ عَنْهُ الشَّرَائِعُ وَزَادَ بَعْضُهُمْ وَاتَّصَلَ بِاللهِ تَعَالَى 'ছূফীরা বলে থাকেন, নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে চিনতে পারবে, তার উপর থেকে শরী'আতের হুকুম রহিত হয়ে যাবে। কেউ একটু বাড়িয়ে বলেছেন, সে আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হবে'।[১৪]

(ক) দেওবন্দী মতবাদের আধ্যাত্মিক নেতা ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী বলেন, 'মা'রেফতের অধিকারী ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবীর উপর কর্তৃত্বশীল হয়। আল্লাহ তা'আলার যে কোন রশ্মিকে নিজের জন্য ধরে নিতে পারে। আল্লাহ্র যে কোন গুণে ইচ্ছা নিজেকে বিভূষিত করে তার প্রকাশ ঘটাতে পারে। যেহেতু তার মধ্যে আল্লাহর গুণাবলী বিদ্যমান এবং আল্লাহ্র চরিত্রে বিলীন।[১৫] অন্য এক জায়গায় বলেন, 'কোনরূপ আড়াল ছাড়াই সে আল্লাহকে দেখতে পাবে। আল্লাহকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করার সে সুযোগ পাবে।[১৬] তিনি আরেক জায়গায় বলেন, 'তাওহীদে জাতি হল এই যে, বিশ্বজগতের সবকিছুকে আল্লাহ বলে ধারণা করা।[১৭]

(খ) মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী বলেন, 'মনোযোগ দিয়ে শোন! সত্য তা-ই যা রশীদ আহমাদের মুখ থেকে বের হয়। আমি শপথ করে বলছি, আমি কিছুই না, কিন্তু এ যুগে সৎপথ প্রাপ্তি এবং সফলতা নির্ভর করে আমার ইত্তেবার উপর'।[১৮]

পর্যালোচনা :

উক্ত ভ্রান্ত মতবাদের মাধ্যমে এদেশের কোটি কোটি মানুষকে মুশরিক বানানো হচ্ছে। এছাড়া মানবদেহের মাঝে আল্লাহর বিলীন হওয়াকে বড় মর্যাদাবান মনে করে। এরপর তার মাধ্যমে যা-ই সংঘটিত হোক সেটাকেই তারা বৈধ মনে করে। এ জন্য তারা নারী-পুরুষ একাকার হয়ে রাতের অন্ধকারে যিকির করাকে পাপের কাজ মনে করে না। তারা এভাবেই আল্লাহর মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। একশ্রেণীর আলেমও এই কুফুরী মতবাদের পিছনে ছুটে বেড়ায়। তারা বান্দা আর মা'বূদের পার্থক্য বুঝে না। এটাই হিন্দুদের আক্বীদা। তারা সর্বেশ্বরবাদ বা সবকিছুকেই ইশ্বর মনে করে। তাই তারা ইশ্বর, মানুষ ও ব্যাঙের মাঝে কোন তফাৎ খুঁজে পায় না। যেমন তারা বলে থাকে- 'হরির উপর হরি, হরি শোভা পায়, হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়। মূলতঃ এটি 'ফানাফিল্লাহ' ভিত্তিক কুফুরী আক্বীদা।

সুধী পাঠক! রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদতে মাশগূল থেকেছেন। বরং বয়স যত বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁরা ইবাদতে তত মনোযোগী হয়েছেন। কারণ আল্লাহর নির্দেশ হল, 'আপনি মৃত্যু পর্যন্ত আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করুন' (নাহল)। অথচ কথিত ছূফীদের নাকি ইবাদত লাগে না। মূলতঃ এটা আল্লাহর ইবাদতে ফাঁকি দেয়ার ভণ্ডামি তরীকা।

(১৭) প্রকৃত ছূফীই আল্লাহ :

ছূফীবাদ যে কত জঘন্য তা আরো বুঝা যায় উক্ত কুফুরী আক্বীদা থেকে। তাদের ধারণা মানবদেহে যখন আল্লাহ প্রবেশ করে তখন মানুষ আল্লাহতে পরিণত হয় هُوَ الْقَوْلُ بِأَنَّ اللهَ يَحِلُّ فِى الْإِنْسَانِ[১৯] ইরানের আবু ইয়াযীদ বিস্তামী (মৃঃ ২৬১ হিঃ) (বায়েযীদ বুস্তামী) বলেন, طَلَبْتُ اللهَ سِتِّيْنَ سَنَةً فَإِذَا أَنَا هُوَ 'আমি ৬০ বছর যাবৎ আল্লাহকে খুঁজছি। এখন দেখছি আমি নিজেই আল্লাহ'।[২০] কেউ

১১. বুখারী হা/৭৫৬১; মিশকাত হা/৪৫৯৩।
১২. বুখারী হা/৩২৮৮; মিশকাত হা/৪৫৯৪।
১৩. বুখারী হা/৪৮০০; মিশকাত হা/৪৫০০।

১৪. আল-ফাছল ফিল মিলাল ৪/১৪৩ পৃঃ।
১৫. যিয়াউল কুলুব (উর্দূ), পৃঃ ২৭-২৮; (বাংলা), পৃঃ ৫১।
১৬. যিয়াউল কুলূব (উর্দূ), পৃঃ ৭ ও ২৫; (বাংলা), পৃঃ ২০ ও ৪৪।
১৭. যিয়াউল কুলূব (উর্দূ), পৃঃ ৩৫; (বাংলা), পৃঃ ৬২।
১৮. তাযকিরাত আর-রশীদ ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭; গৃহীত : তাবলীগ জামা'আত ও দেওবন্দীগণ, পৃঃ ২২২।
১৯. ইবনু তায়মিয়াহ, আল-জাওয়াবুছ ছহীহ ৩/৩২৯ পৃঃ।
২০. আব্দুর রহমান দেমাস্কী, আন-নকশাবন্দইয়াহ (রিয়ায : দারু ত্বাইয়েবাহ, ১৯৮৮), পৃঃ ৬২।

Contents

তাকে ডাক দিলে বাড়ীর ভিতর থেকে বলতেন, لَيْسَ فِى الْبَيْتِ غَيْرُ اللهِ ‘বাড়ীতে আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই’।[২১] আরো কঠোরভাবে নিজেকে আল্লাহ দাবী করে বলেন, سُبْحَانِىْ سُبْحَانِىْ مَا أَعْظَمَ شَأْنِىْ ‘আমি মহা পবিত্র, ‘আমি মহা পবিত্র, আমার মর্যাদা কতই না বড়’।[২২] আল্লাহ তার দেহের মধ্যে একাকার হয়ে গেছে ফলে তিনি নিজেই আল্লাহ হয়ে গেছেন। তারই অনুসারী হুসাইন বিন মানছূর হাল্লাজ (মৃতঃ ৩০৯ হিঃ) বলেন, نَحْنُ رُوْحَانِ حَلَّلْنَا بَدَنًا ‘আমরা দু’টি রূহ। এখন একটি দেহে একাকার হয়ে গেছি’। তাই জোর দিয়ে বলেন, أَنَا الْحَقُّ ‘আমিই আল্লাহ’।[২৩] উক্ত দাবী করায় মুরতাদ ঘোষণা করে তাকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।[২৪]

পর্যালোচনা :

উক্ত আক্বীদা যে কুফুরী তা হয়ত কাউকে বুঝানো লাগবে না। ছূফীবাদের গড়ার কথা মূলতঃ এটাই। ফেরাউন নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করলেও আল্লাহর মাঝে বিলীন হওয়ার মিথ্যা দাবী করেনি। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হল, ফেরাউনপন্থী এ সমস্ত লোকের ভক্ত উপমহাদেশে অনেক বেশী। তারা আল্লাহর নামে লোক দেখানো যিকির করলেও আল্লাহর মর্যাদা নষ্ট করেছে। এদের থেকে সাবধান!

(১৮) খানকা, মাযার, কবরস্থান, তীর্থস্থান, গাছতলা, পাথর, খাম্বা, শহীদ মিনার, প্রতিকৃতি ইত্যাদি স্থানে মানত করা এবং ওরসের আয়োজন করা।

পর্যালোচনা :

এদেশের কোটি কোটি মানুষ উক্ত স্থান সমূহে মানত করে মাকছূদ পূরণের চেষ্টা করে। তার থেকে বরকত নেয়ায় বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস শিরকে আকবার বা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনকিছু বা কারো নামে মানত করা ও যবহে করা হারাম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে উপমহাদেশে মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ মাযার তৈরি হয়েছে। আর সেগুলোতে একাধিক মসজিদও আছে, যা মৃত পীরকে বেষ্টন করে রেখেছে। সেখানে প্রত্যেক বছর ওরস করা হয়। লাখ লাখ মানুষের ভীড় জমে। আর এই তীর্থস্থানেই মানুষ কোটি কোটি টাকা, গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি নযর-নেওয়ায করছে। যার মূল উদ্দেশ্যই থাকে মৃত পীরকে খুশি করা। আরো দুঃখজনক হল, উক্ত স্থানগুলোতে মসজিদ তৈরি করে ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ উক্ত স্থান সমূহে ছালাত আদায় করা পরিষ্কার হারাম। শরী‘আতে এগুলোকে ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘পৃথিবীর পুরোটাই মসজিদ। তবে কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত।[২৫]

তাছাড়া কবরের মাঝে ছালাত আদায় করা যাবে না মর্মে স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কবরের মাঝে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।[২৬]

عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّىْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

জুনদুব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নবী ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করো না। নিশ্চয় আমি তোমদেরকে এটা থেকে নিষেধ করছি।[২৭]

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবরে পরিণত করো না এবং আমার কবরকে আনন্দ অনুষ্ঠানে পরিণত করো না। তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ কর। তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌছানো হয়।[২৮]

অন্য হাদীছে এসেছে, لَا تَتَّخِذُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا ‘তোমরা আমার কবরকে আনন্দ অনুষ্ঠানের স্থান হিসাবে গ্রহণ করো না’।[২৯]

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

আত্বা ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করবেন না, যেখানে ইবাদত করা হবে। ঐ জাতির উপর আল্লাহ কঠিন গযব বর্ষণ করুন, যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে’।[৩০] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُصَلَّى لَهُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

যায়েদ ইবনু আসলাম (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করবেন না, যেখানে ছালাত আদায় করা হবে। ঐ জাতির উপর আল্লাহ

---

২১. মাওসূ‘আতুর রাদ্দি আলাছ ছূফিয়াহ ৬৮/৭১ পৃঃ।- جاء الى بيته رجـــل فدق بابه فقال أبو يزيد من تطلب؟ فقال الطارق أريد أبـــا يزيـــد. فقال له أبو يزيد ليس في البيت غير الله

২২. ড. সাফার আব্দুর রহমান, উছূলুল ফিরাক ওয়াল আদইয়ান ওয়াল মাযাহিবুল ফিকরিয়া (মিশর : দারুর রুউওয়াদ, ২০১৩), পৃঃ ৮৫।

২৩. আব্দুর রহমান দেমাস্কী, আন-নকশাবন্দইয়াহ (রিয়ায : দারু ত্বাইয়েবাহ, ১৯৮৮), পৃঃ ৬২; মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারী ’৯৯, পৃঃ ৭।

২৪. হাক্বীক্বাতুছ ছূফিয়াহ, পৃঃ ১৯।

২৫. তিরমিযী হা/৩১৭, ১/৭৩ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৭৪৫; মিশকাত হা/৭৩৭, পৃঃ ৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৮১, ২/২২৮ পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘মসজিদ সমূহ’ অনুচ্ছেদ। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিছগণ বলেন, কবর ক্বিবলার সামনে থাক কিংবা ডানে থাক, বামে থাক বা পিছনে থাক সে স্থানে ছালাত হবে না।- আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃঃ ২১৪; আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ৩৫৭- وسواء في ذلك أ كان القبر قبلته أو عن يمينه أو عن يساره و خلفه لكـــن اســـتقباله بالصلاة أشد لقوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهـــود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

২৬. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৩১৩, সনদ ছহীহ।

২৭. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৬, ১/২০১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১০৬৯), ‘মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪; মিশকাত হা/৭১৩, পৃঃ ৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৬০, ২/২২০ পৃঃ।

২৮. আবুদাঊদ হা/২০৪২, ১/২৭৯ পৃঃ, ‘হজ্জ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১০০; নাসাঈ, মিশকাত হা/৯২৬, পৃঃ ৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৬৫, ২/৩১১ পৃঃ।

২৯. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৭৫৪২; আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ, পৃঃ ১১৩।

৩০. মালেক মুওয়াত্ত্বা হা/৫৯৩, সনদ ছহীহ।

কঠিন শাস্তি বর্ষণ করুন, যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।[৩১]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) কবর পাকা করতে, তার উপর বসতে এবং এর উপর সমাধি সৌধ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।[৩২]

عَنْ أَبِىْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا.

আবু মারছাদ গানাবী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কবরের দিকে ছালাত আদায় কর না এবং তার উপর বস না।[৩৩]

সুধী পাঠক! বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ যিনি, তিনি তাঁর কবরস্থানকে ওরস বা আনন্দ অনুষ্ঠানে পরিণত করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। নবী-রাসূল ও সৎকর্মশীল বান্দাদের কবরকে মসজিদে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন এবং যারা এ ধরনের জঘন্য কাজ করবে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দানের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট বদ দু'আ করেছেন। তাহলে সাধারণ লোকদের কবরকে কিভাবে মসজিদের স্থান হিসাবে নির্ধারণ করা যাবে? তাদের কবরস্থানে কিভাবে ওরস করা যাবে?

এ সমস্ত কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মৃত ব্যক্তির কবরকে কেন্দ্র করে কেন লক্ষ লক্ষ মাযার-খানকা তৈরি হয়েছে? সেখানে মসজিদ তৈরি করে কেন কোটি কোটি মানুষের ঈমান হরণ করা হচ্ছে? কবরকে সিজদা করে, সেখানে মাথা ঠুকে আল্লাহ্‌র তাওহীদী চেতনাকে কেন নস্যাৎ করা হচ্ছে? তাদের কর্ণকুহরে এই সমস্ত বাণী কেন প্রবেশ করে না? কারণ হল, প্রতিনিয়ত তাদেরকে নগ্ন জিন শয়তান মূর্তিপূজা করতে উৎসাহিত করছে। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, مَعَ كُلِّ صَنَمٍ جِنِّيَّةٌ 'প্রত্যেক মূর্তির সাথে একজন করে নারী জিন থাকে'।[৩৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُوْنَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَرِيْدًا 'আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা কেবল নারীদের আহ্বান করে। বরং তারা বিদ্রোহী শয়তানকে আহ্বান করে' *(নিসা ১১৭)*। নিম্নের হাদীছে আরো পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে-

عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ إِلَى نَخْلَةٍ وَكَانَتْ بِهَا الْعُزَّى فَأَتَاهَا خَالِدٌ وَكَانَتْ عَلَى ثَلاَثَ سَمُرَاتٍ فَقَطَعَ السَّمُرَاتِ وَهَدَمَ الْبَيْتَ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ ارْجِعْ فَإِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا فَرَجَعَ خَالِدٌ فَلَمَّا أَبْصَرَتْ بِهِ السَّدَنَةُ وَهُمْ حَجَبَتْهَا أَمْعَنُوْا فِى الْجَبَلِ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ يَا عُزَّى فَأَتَاهَا خَالِدٌ فَإِذَا هِىَ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ نَاشِرَةٌ شَعْرَهَا تَحْتَفِنُ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهَا فَعَمَّمَهَا بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ تِلْكَ الْعُزَّى.

আবু তোফাইল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মক্কা বিজয় করলেন তখন খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রাঃ)-কে একটি খেজুর গাছের নিকট পাঠালেন। সেখানে উযযা নামক মূর্তি ছিল। খালিদ (রাঃ) সেখানে আসলেন। মূর্তিটি তিনটি বাবলা গাছের উপর ছিল। তিনি সেগুলো কেটে ফেললেন এবং তার উপরে তৈরি করা ঘর ভেঙ্গে দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে এসে খবর দিলেন। তিনি বললেন, ফিরে যাও, তুমি কোন অপরাধ করোনি। অতঃপর খালিদ (রাঃ) ফিরে গেলেন। যখন খালিদ (রাঃ)-কে পাহারাদাররা দেখল তখন তারা ঐ মূর্তিকে পাহাড়ের মধ্যে রক্ষা করার জন্য বেষ্টন করে ঘিরে ফেলল এবং হে উযযা! বলে ডাকতে লাগল। খালিদ (রাঃ) কাছে এসে বিস্তৃত চুল বিশিষ্ট এক নগ্ন মহিলাকে দেখতে পেলেন, যার মাথা কাদায় ল্যাপ্টানো। তিনি তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন এবং হত্যা করলেন। অতঃপর ফিরে এসে রাসূল (ছাঃ)-কে খবর দিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটাই সেই উযযা।[৩৫] উল্লেখ্য যে, শয়তানের পরামর্শেই মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছে।[৩৬]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ نُصُبًا فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُوْدٍ فِىْ يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُوْلُ (جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ). رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, (মক্কা বিজয়ের দিনে) রাসূল (ছাঃ) মক্কায় প্রবেশ করলেন। তখন কা'বার চারপাশে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করা ছিল। রাসূল (ছাঃ) তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, 'হক্ব এসেছে বাতিল চুরমার হয়েছে'।[৩৭]

عَنْ أَبِى الْهَيَّاجِ الأَسَدِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِىْ عَلِىُّ بْنُ أَبِىْ طَالِبٍ أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِىْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ لاَّ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবুল হাইয়াজ (রাঃ) বলেন, আলী (রাঃ) একদা আমাকে বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে যে জন্য পাঠিয়েছিলেন, আমি কি তোমাকে সে জন্য পাঠাব না? তিনি বলেছিলেন, 'তুমি কোন মূর্তি না ভাঙ্গা পর্যন্ত ছাড়বে না এবং কোন উঁচু কবর ছাড়বে না যতক্ষণ তা ভেঙ্গে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে না দিবে।[৩৮]

عَنْ نَافِعٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أُنَاسًا يَأْتُوْنَ الشَّجَرَةَ الَّتِىْ بُوْيِعَ تَحْتَهَا قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ

নাফে' (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) এ মর্মে জানতে পারলেন যে, যে গাছের নীচে রাসূল (ছাঃ) বায়'আত নিয়েছিলেন, ঐ গাছের কাছে মানুষ ভীড় করছে। তখন তিনি নির্দেশ দান করলে তা কেটে ফেলা হয়।[৩৯]

(চলবে)

---

৩১. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৭৫৪৪, সনদ ছহীহ।
৩২. ছহীহ মুসলিম হা/২২৮৯, ১/৩১২ পৃঃ, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩২ (ইফাবা হা/২১১৪); মিশকাত হা/১৬৯৭, পৃঃ ১৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬০৬, ৪/৭৩ পৃঃ।
৩৩. ছহীহ মুসলিম হা/২২৯৫, ১/৩১২ পৃঃ, (ইফাবা হা/২১২০); মিশকাত হা/১৬৯৮, পৃঃ ১৪৮।
৩৪. আহমাদ হা/২১২৬৯, সনদ হাসান; আল-আহাদীছুল মুখতারাহ হা/১১৫৭।
৩৫. নাসাঈ কুবরা হা/১১৫৪৭; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/৯০২, সনদ ছহীহ।
৩৬. সূরা নূহ ২৩; ছহীহ বুখারী হা/৪৯২০, ২/৭৩২ পৃঃ, 'তাফসীর' অধ্যায়, সূরা নূহ।
৩৭. বুখারী হা/২৪৭৮, ১/৩৩৬ পৃঃ, 'মাযালেম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩২; মুসলিম হা/৪৭২৫-بَابُ إِزَالَةِ الأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَـــةِ। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে মূর্তি ভেঙ্গে খান খান করার জন্য এবং আল্লাহ্‌র তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যেন তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা হয়- ছহীহ মুসলিম হা/১৯৬৭, ১/২৭৬ পৃঃ, 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫২- أَرْسَلَنِىْ بِصِلَةِ الأَرْحَامِ وَكَسْرِ الأَوْثَانِ وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَىْءٌ।
৩৮. ছহীহ মুসলিম হা/২২৮৭, ১/৩১২ পৃঃ, (ইফাবা হা/২১১২); মিশকাত হা/১৬৯৬, পৃঃ ১৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬০৫, ৪/৭২ পৃঃ, 'মৃতকে দাফন করা' অনুচ্ছেদ।
৩৯. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৭৫৪৫; তাহযীরুস সাজেদ, পৃঃ ৮৩।

ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যুবকদের অবদান

-আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস

ভূমিকা :

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যুবকদের অবদান অতুলনীয়। দুর্বার উদ্দীপনা, ক্লান্তিহীন গতি, অপরিসীম ঔদার্য্য, অফুরন্ত প্রাণ ও অটল সাধনার প্রতীক যুবকদের দ্বারাই হক্বের বিজয়ী পতাকা উড্ডীন হয়েছে এবং বাতিলের পরাজয় সূচিত হয়েছে। তাদেরই অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও জান-মালের কুরবানীর বিনিময়ে পৃথিবীর বুকে তাওহীদ ও সুন্নাতের চির অম্লান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং নমরূদ, ফেরাউন ও কারূণ এবং যুগে যুগে তাদের উত্তরসূরীরা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। নিম্নে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যুবকদের অবদান উল্লেখ পূর্বক তাদের অবদান থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

১. সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় প্রথম জীবন উৎসর্গকারী হাবীল :

বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম মানুষ ও নবী আদম (আঃ)-এর দু'পুত্র ছিলেন ক্বাবীল ও হাবীল। ক্বাবীল ছিলেন আদমের প্রথম সন্তান ও সবার বড়। আর হাবীল ছিলেন তার ছোট ভাই। তারা দু'ভাই আল্লাহ্র নামে কুরবানী করেছিলেন (*মায়েদা ৫/২৭*)। সে যুগে কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন ছিল, আসমান থেকে আগুন এসে কুরবানী নিয়ে অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানীকে আগুন গ্রহণ করত না, সে কুরবানীকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হত। কৃষিজীবী ক্বাবীল কিছু শস্য কুরবানীর জন্য পেশ করলেন। আর পশুপালক হাবীল আল্লাহ্র মহব্বতে তার উৎকৃষ্ট দুম্বাটি কুরবানীর জন্য পেশ করলেন। অতঃপর আসমান থেকে আগুন এসে হাবীলের কুরবানী নিয়ে গেল। কিন্তু ক্বাবীলের কুরবানী পড়ে রইল। এতে ক্বাবীল ক্ষুব্ধ হয়ে হাবীলকে বলল, لَأَقْتُلَنَّكَ 'আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব'। যুবক হাবীল তখন তাকে উপদেশ দিয়ে মার্জিত ভাষায় বলেছিলেন,

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ- لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাক্বীদের থেকে (কুরবানী) কবুল করে থাকেন। যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হও তবে আমি তোমাকে পাল্টা হত্যা করতে উদ্যত হব না। কেননা আমি জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি' (*মায়েদাহ ৫/২৭-২৮*)। ক্বাবীল স্রেফ হিংসার বশবর্তী হয়ে হাবীলকে হত্যা করেছিলেন। তিনি চাননি যে, ছোট ভাই হাবীল তার চাইতে উত্তম ব্যক্তি হিসাবে সমাজে প্রশংসিত হৌক।[৪০] এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ভালোর প্রতি মন্দ লোকের হিংসা ও আক্রোশ মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। এর ফলে ভাল লোকেরা সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও চূড়ান্ত বিচারে তারাই লাভবান হয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে মন্দ লোকেরা সাময়িকভাবে লাভবান হলেও চূড়ান্ত বিচারে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। নির্দোষ হাবীলকে হত্যা করে ক্বাবীল অনন্ত ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 'অতঃপর সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল' (*মায়েদাহ ৫/৩০*)। অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যার সিলসিলা ক্বাবীলের মাধ্যমে শুরু হয়। বিধায় অন্যায়ভাবে সকল হত্যাকারীর পাপের একটা অংশ কাবীলের আমল নামায় যুক্ত হবে।[৪১] হত্যা সাধারণত যুবকদের দ্বারাই বেশি সংঘটিত হয়। অতএব অন্যায়ের সূচনাকারীরা সাবধান!

শিক্ষণীয় বিষয় :

(ক) মানুষ অন্যের ইচ্ছাধীন পুতুল নয় বরং সে স্বাধীন প্রাণী হিসাবে তার মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তি বিদ্যমান।

(খ) পৃথিবীর প্রথম হত্যাকাণ্ড যুবক ক্বাবীলের মাধ্যমে সংঘঠিত হয়েছিল কুপ্রবৃত্তির পূজারী হয়ে। তাই কুপ্রবৃত্তির ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

(গ) ভালোর প্রতি মন্দ লোকের হিংসা চিরন্তন। অতএব হিংসা থেকে সাবধান!

(ঘ) অন্যায়ভাবে হত্যা সর্বাপেক্ষা জঘন্য পাপ এবং তওবা ব্যতীত হত্যাকারীর কোন আমল কবুল হবে না।

(ঙ) মুত্তাক্বী ব্যক্তিগণ অন্যায়ের পাল্টা অন্যায় করেন না, বরং আল্লাহর উপর ভরসা করে তাঁর নিকট প্রতিদান কামনা করেন।

(চ) অন্যাকারী এক সময় অনুতপ্ত হয় এবং অন্তর্জালায় দগ্ধীভূত হয়। অবশেষে এর সূচনাকরীদের উপর সকল পাপের বোজা চাপে। অতএব অন্যায়ের সূচনাকারী সকল স্তরের ব্যক্তিগণ সাবধান!

২. স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গকারী তরুণ ইসমাঈল (আঃ) :

বহু অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ আবুল আম্বিয়া ইবরাহীম (আঃ)-এর ৮৬ বছর বয়সে বিবি হাজেরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ইসমাঈল। তরুণ ইসমাঈলের বয়স ১৩/১৪ বছর। তিনি যখন বৃদ্ধ পিতার সহযোগী হতে চলেছেন এবং পিতৃ হৃদয় পুরোপুরি জুড়ে বসেছেন, ঠিক তখনই তাকে কুরবানীর নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

'যখন সে (ইসমাঈল) পিতার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হল, তখন তিনি (ইবরাহীম) তাকে বললেন, হে আমার বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে- আমি তোমাকে যবহ্ করছি। এখন বল, তোমার মতামত কী? সে বলল, হে আব্বা! আপনাকে যা নির্দেশ করা হয়েছে, আপনি তা কার্যকর করুন। আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ছবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন' (*ছাফ্‌ফাত ৩৭/১০২*)।

৪০. ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৪৪।

৪১. বুখারী হা/৩৩৩৫; মিশকাত হা/২১১ 'ইলম' অধ্যায়।

তরুণ ইসমাঈল নিজেকে ‘ছবরকারী’ না বলে ছবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। এর মাধ্যমে তিনি নিজের পিতাসহ পূর্বেকার বড় বড় আত্মোৎসর্গকারীদের মধ্যে নিজেকে শামিল করে নিজেকে অহমিকামুক্ত করেছেন। যদিও তাঁর ন্যায় তরুণের এরূপ স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গের ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেছিল বলে জানা যায় না (*নবীদের কাহিনী, ১/১৩৯ পৃঃ*)। মহান আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ- وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ- قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.

‘অতঃপর (পিতা-পুত্র) উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং পিতা পুত্রকে উপুড় করে শায়িত করল, তখন আমরা তাকে ডাক দিয়ে বললাম, ‘হে ইবরাহীম! তুমি তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছ। আমরা এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি’ (*ছাফ্ফাত ৩৭/১০৩-১০৫*)।

বিশ্ব মুসলিম এই সুন্নাত অনুসরণে ১০ই যিলহজ্জ বিশ্বব্যাপী শরী‘আত নির্ধারিত পশু কুরবানী দিয়ে থাকে। পিতার আহ্বানে স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গকারী তরুণ ইসমাঈল স্বতস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছেন বলেই কুরবানীর গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয়েছে। তিনি যদি পিতার অবাধ্য হতেন এবং দৌড়ে পালিয়ে যেতেন তাহলে আল্লাহ্র হুকুম পালন করা ইবরাহীমের পক্ষে আদৌ সম্ভব হত না। এখানে মা হাজেরার অবদানও ছিল অসামান্য। তাইতো বাংলার বুলবুল কাজী নজরুল ইসলাম গেয়েছেন,

মা হাজেরা হৌক মায়েরা সব
যবীহুল্লাহ হৌক ছেলেরা সব,
সবকিছু যাক সত্য রৌক
বিধির বিধান সত্য হৌক।

বর্তমানে বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে প্রতিটি যুবককে ইসমাঈল (আঃ)-এর মত হতে হবে, তবেই সেখানে নেমে আসবে পরম করুণাময় আল্লাহ্র রহমতের ফল্গুধারা।

শিক্ষণীয় বিষয় :

(ক) আল্লাহ্র মহব্বত ও দুনিয়াবী মহব্বত একত্রিত হলে দুনিয়াবী মহব্বতকে কুরবানী দিয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ মানতে হবে।
(খ) পিতা-মাতা ও প্রবীণদের কল্যাণময় নির্দেশনা এবং তরুণদের আনুগত্য ও উদ্দীপনার সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে চিরস্মরণীয় ইতিহাস রচনা করা সম্ভব।

৩. যৌবনের মহাপরীক্ষায় ইউসুফ (আঃ) :

পৃথিবীর সুন্দরতম মানুষ ইউসুফ (আঃ) অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর আযীযে মিসর তথা মিসরের অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রী ক্বিত্বফীর (قطفير)-এর গৃহে পুত্র স্নেহে লালিত পালিত হন। অতঃপর যৌবনে পদার্পণকারী অনিন্দ্য সুন্দর ইউসুফের প্রতি মন্ত্রীর নিঃসন্তান পত্নী যুলায়খার আসক্তি জন্মে। সে ইউসুফকে কুপ্রস্তাব দেয়। এ দিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন,

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ.

‘আর তিনি যে মহিলার বাড়ীতে থাকতেন ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং (একদিন) ঘরের দরজা সমূহ বন্ধ করে দিয়ে বলল, কাছে এসো! ইউসুফ বললেন, আল্লাহ (আমাকে) রক্ষা করুন। তিনি (অর্থাৎ আপনার স্বামী) আমার মনিব। তিনি আমার উত্তম বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীগণ সফলকাম হয় না’ (*ইউসুফ ১২/২৩*)।

অতুলনীয় রূপ-লাবণ্যের অধিকারী যুবক ইউসুফ (আঃ) কুপ্রস্তাবে সম্মত না হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে যুলায়খা পিছন থেকে তার জামা টেনে ধরে এবং তা ছিঁড়ে যায়। দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই দু’জন ধরা পড়ে যায় বাড়ীর মালিক ক্বিত্বফীরের কাছে। পরে যুলায়খার সাজানো কথামত নির্দোষ ইউসুফের জেল হয় (*নবীদের কাহিনী ১/১৭৭ পৃঃ*) সুন্দরী নারীর হাতছানী উপেক্ষা করে ইউসুফ (আঃ) সাত বছর জেল খাটেন এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করেন। তবুও তিনি নিজের চারিত্রিক নিষ্কলুষতা অটুট রাখেন। শুধুমাত্র আল্লাহভীতির বদৌলতে ইউসুফ (আঃ) নোংরা মহিলার কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বিনিময়ে নির্দোষ ইউসুফকে কারা নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। অতএব হে যুবসম্প্রদায়! যাবতীয় নোংরামী ও অশ্লীলতা থেকে নিজেকে বিরত রাখ। তুমিতো আল্লাহভীরু ইউসুফের যোগ্য উত্তরসূরী।

শিক্ষণীয় বিষয় :

(ক) নবীগণ মানুষ ছিলেন এবং মনুষ্যসুলভ স্বাভাবিক প্রবণতাও তাদের মধ্যে ছিল। তবে আল্লাহ্র বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তারা যাবতীয় কাবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত ও নিষ্পাপ ছিলেন।

(খ) জেল-যুলুমসহ দুনিয়াবী বিপদাপদের ভয় থাকলেও নিজের চারিত্রিক নিষ্কলুষতা সর্বদা অটুট রাখতে হবে। তবে কাঙ্খিত সফলতা অর্জন করা যাবে।

(গ) সত্য একদিন প্রকাশিত হবেই। তাই দুনিয়াবী হাতছানী ও অপবাদ উপেক্ষা করে সর্বদা ন্যায় পথে অটল থাকতে হবে।

৪. আছহাবুল উখদূদের ঘটনায় বর্ণিত ঈমানদার যুবক :

দ্বীনে হক্ব প্রতিষ্ঠায় যুবকদের অবদান দিবালোকের ন্যায় ফুটে উঠেছে আছহাবুল উখদূদের ঐতিহাসিক ঘটনায়। বনী ইসরাঈলের এক ঈমানদার যুবক নিজের জীবন দিয়ে জাতিকে হক্বের রাস্তা প্রদর্শন করে গেছেন। ছুহাইব বিন সিনান আর রূমী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে এ বিষয়ে এক দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তা সংক্ষেপে এই যে, বহুকাল পূর্বে এক রাজা ছিলেন, যার ছিল এক বৃদ্ধ যাদুকর। তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার আশঙ্কায় একজন বালককে তার নিকটে যাদুবিদ্যা শেখার জন্য নিযুক্ত করা হয়। বালকটির নাম ‘আব্দুল্লাহ ইবনুছ ছামের’। তার যাতায়াতের পথে একটি গীর্জায় একজন পাদ্রী ছিলেন। বালকটি দৈনিক তার কাছে বসত। পাদ্রীর কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে সে মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু তা গোপন রাখে। একদিন যাতায়াতের পথে বড় একটি হিংস্র জন্তু রাস্তা আটকে রাখে। বালকটি মনে মনে বলল, আজ আমি দেখব, পাদ্রী শ্রেষ্ঠ না যাদুকর শ্রেষ্ঠ? সে তখন একটি পাথর হাতে নিয়ে বলল ‘হে আল্লাহ! পাদ্রীর কর্ম যাদুকরের কর্ম হতে আপনার কাছে অধিক পসন্দনীয় হলে এ জন্তুটিকে মেরে ফেলুন। এই বলে সে পাথরটি নিক্ষেপ করল এবং ঐ পাথরের আঘাতে জন্তুটি মারা পড়ল।

অতঃপর এ খবর পাদ্রীর কানে পৌঁছে গেল। তিনি বালকটিকে ডেকে বললেন, ‘হে বৎস’ তুমি এখনই আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছ। শীঘ্রই তুমি পরীক্ষায় পড়বে। যদি পড়, তবে আমার কথা প্রকাশ করে দিও না। বালকটির কারামত চারিদিকে ছড়িয়ে

পড়ল। তার দো'আয় জন্মান্ধ ব্যক্তি চক্ষুষ্মান হতে লাগল, কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি নিরাময় হতে লাগল এবং লোকজন অন্যান্য রোগ হতেও আরোগ্য লাভ করতে লাগল। ঘটনাক্রমে রাজার এক সভাসদ ঐ সময় অন্ধ হয়ে যান। তিনি বহু মূল্যের উপঢৌকনাদি নিয়ে বালকটির নিকট গমন করেন। বালকটি তাকে বলে, 'আমি কাউকে রোগমুক্ত করি না। এটা কেবল আল্লাহ করেন। এক্ষণে যদি আপনি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনেন তাহলে আমি আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করতে পারি। তাতে হয়ত তিনি আপনাকে আরোগ্য দান করবেন'। মন্ত্রী ঈমান আনলে বালক দো'আ করল। অতঃপর তিনি দৃষ্টি শক্তি পেলেন। পরে রাজদরবারে গেলে রাজার প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, আমার পালনকর্তা আমাকে সুস্থ করেছেন। রাজা বললেন, আমি ছাড়া তোমার রব আছে কি? মন্ত্রী বললেন, আমার ও আপনার উভয়ের রব আল্লাহ। তখন রাজার হুকুমে তার উপর নির্যাতন শুরু হয়। একপর্যায়ে তিনি উক্ত বালকের নাম বলে দেন। বালককে ধরে এনে একই প্রশ্নের অভিন্ন জবাব পেয়ে তার উপর চালানো হয় কঠোর নির্যাতন। ফলে একপর্যায়ে সেও পাদ্রীর কথা বলে দেয়। তখন পাদ্রীকে ধরে আনা হলে তিনিও একই জবাব দেন। রাজা তাদেরকে তাদের দ্বীন ত্যাগ করতে বললে তারা অস্বীকার করেন। তখন পাদ্রী ও মন্ত্রীকে জীবন্ত অবস্থায় করাতে চিরে তাদের মাথাসহ দেহকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়।

অতঃপর একইভাবে বালকটিও দ্বীন পরিত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে কিছু সৈন্যের সাথে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় তুলে সেখান থেকে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে, পাহাড় কেঁপে উঠে, এতে তার সঙ্গী সাথীরা পাহাড়ের চূড়া হতে নিচে পড়ে মারা যায় এবং বালকটি প্রাণে রক্ষা পায়। অতঃপর তাকে নৌকায় করে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে পানিতে ফেলে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু নৌকা উল্টে রাজার লোকজন মারা পড়ে এবং বালকটি বেঁচে যায়। দু'বারই বালকটি আল্লাহ্‌র নিকটে দো'আ করেছিল, হে আল্লাহ! আপনার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে এদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন।' পরে বালকটি রাজাকে বলল, আপনি আমার নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ না করলে আমাকে হত্যা করতে পারবেন না। রাজা বলল, সেটা কী? বালকটি বলল, আপনি সমস্ত লোককে একটি ময়দানে জমা করুন এবং সেই ময়দানে একটি খেজুর গাছের গুঁড়ি পুঁতে তার উপরিভাগে আমাকে বেঁধে রাখুন। অতঃপর আমার তূণীর হতে একটি তীর ধনুকে সংযোজিত করে নিক্ষেপের সময় বলুন, بسم الله رب الغلام 'বালকটির রব আল্লাহ্‌র নামে'! রাজা তাই করলেন এবং বালকটি মারা গেল। এ দৃশ্য দেখে উপস্থিত জনগণ বলে উঠল, আমরা বালকটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম। তখন রাজার নির্দেশে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে বিশাল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে সবাইকে হত্যা করা হল। নিক্ষেপের আগে প্রত্যেককে দ্বীনে হক্ব ত্যাগের বিনিময়ে মুক্তির কথা বলা হয়। কিন্তু কেউ তা মানেনি। শেষদিকে একজন রমণীকে তার শিশুসন্তানসহ উপস্থিত করা হল। রমণীটি আগুনে ঝাঁপ দিতে ইতস্ততবোধ করতে থাকলে শিশুটি বলে উঠন إصبر يا امه! فانك علي الحق 'হে আমার মা! ছবর (করতঃ আগুনে প্রবেশ) করুন। কেননা আপনি হক্ব পথে আছেন'।[42] এ ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, একজন যুবক দ্বীনে হক্বকে প্রচারের খাতিরে স্বেচ্ছায় নিজের হত্যার কৌশল শত্রুর নিকট ব্যক্ত করেছিল। ফলে তার আত্মত্যাগের বিনিময়ে হাযার হাযার নারী পুরুষ শিরক বর্জন করে তাওহীদ গ্রহণ করতঃ পরকালীন মুক্তির দিশা খুঁজে পেয়েছিল। এমনিভাবে যুবকদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে সমাজে দাম্ভিকদের দম্ভ চূর্ণ হয়ে তদস্থলে হক্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হবে ইনশাআল্লাহ। অকর্মণ্য তরুণ সমাজ উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে কি!

শিক্ষণীয় বিষয় :

(ক) প্রত্যেক আদম সন্তান স্বভাবধর্ম ইসলামের উপর জন্ম গ্রহণ করে।

(খ) রোগ-মুক্তির মালিক একমাত্র আল্লাহ; কোন ভণ্ড ওলী, দরবেশ, পীর-ফকীর, সাধু-সন্ন্যাসী বা তাবীয-কবয নয়।

(গ) যাবতীয় যাদু-বিদ্যা ও শিরকী কর্মকাণ্ড ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র কালাম শিক্ষা করতে হবে।

(ঘ) হক্ব পথের নির্ভীক সৈনিকরা জীবনের তরে কখনো বাতিলের সামনে ঈমান বিকিয়ে দেয় না।

(ঙ) একজন হক্বপন্থী তরুণ ও যুবকের আত্মত্যাগের বিনিময়েই পৃথিবীতে হাযার হাযার মানুষ শিরকী পথ বর্জন করে জান্নাতী পথে জীবন উৎসর্গ করেছে। অতএব যুবকগণ এগিয়ে আসুন সেই জান্নাতী পথে।

৫. সাইয়েদুশ শুহাদা হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) :

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন মক্কার বিস্তৃত অঞ্চল অন্যায় ও অত্যাচারের ঘনকালো মেঘমালা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, মুসলমানগণ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন, সে সময় যে সকল অকুতোভয় যুবক ছাহাবী ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় বুকের তাজা খুন ঝরিয়েছিলেন, বাতিলের বিরুদ্ধে হক্বের ঝাণ্ডা উড্ডীন করতে শাহাদতের অমীয় পেয়ালা পান করেছিলেন হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব (ছাঃ) ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুওঅত প্রাপ্তির ৬ষ্ঠ নববী বর্ষের শেষ দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। ঘটনাটি হল, যিলহজ্জ মাসের কোন একদিনে ছাফা পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় আবু জাহল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখে প্রথমে অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করল এবং অনেক অপমান সূচক কথাবার্তা বলল। তাতে তাঁর কোন প্রত্যুত্তর ও ভাবান্তর দেখতে না পেয়ে অবশেষে আবু জাহল একটা পাথর তুলে রাসূলের (ছাঃ) মাথায় আঘাত করল। তাতে তাঁর মাথা ফেটে রক্তধারা প্রবাহিত হতে থাকল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চুপচাপ সবকিছু সহ্য করলেন।

আবু জাহল অতঃপর কা'বা ঘরের নিকটে গিয়ে তার দলবলের সাথে বসে উক্ত কাজের জন্য গৌরব যাহির করতে থাকল। আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আনের জনৈক দাসী ছাফা পাহাড়ের উপরে তার বাসা থেকে এ ঘটনা আদ্যোপান্ত অবলোকন করে। ঐ সময় বীর সেনানী যুবক হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব শিকার থেকে তীর ধনুক সুসজ্জিত অবস্থায় ঘরে ফিরছিলেন। উল্লেখ্য যে, হামযাহ (রাঃ) শিকারে খুবই দক্ষ ছিলেন। তখন উক্ত দাসীর নিকট সব ঘটনা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কালমুহূর্ত বিলম্ব না করে হামযা (রাঃ) ছুটলেন আবু জাহলের খোঁজে। তিনি ছিলেন কুরায়েশগণের মধ্যে মহাবীর ও শক্তিশালী যুবক। খোঁজ করতে করতে তাকে পেলেন মসজিদুল হারামে। সেখানে তিনি তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তীব্র ভাষায় গালিগালাজ করে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, يا مُصَفِّرَ اسْتَه تشتم ابن أخي وأنا على دينه 'হে গুহ্যদ্বার দিয়ে রায়ু নিঃসরণকারী (অর্থাৎ কাপুরুষ)! তুমি আমার

৪২. ছহীহ মুসলিম হা/৩০০৫ যুহদ ও রিকাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৭, আহমাদ হা/২৩৯৭৬, তিরমিযীর বর্ণনা অনুযায়ী ঐ দিন ৭০ হাযার মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়। সনদ জাইয়িদ।

ভাতিজাকে গালি দিয়েছ, অথচ আমি তার দ্বীনের উপরে আছি? এরপর ধনুক দিয়ে তার মাথায় এমন জোরে আঘাত করলেন যে, সে চরমভাবে যখম হয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেল। ফলে আবু জাহলের বনু মাখযূম গোত্র এবং হামযাহ্‌র বনু হাশেম গোত্র পরস্পরের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এমতাবস্থায় আবু জাহল নিজের দোষ স্বীকার করে নিজ গোত্রকে নিরস্ত করল। ফলে আসন্ন খুনোখুনি হতে উভয় পক্ষ বেঁচে গেল।[৪৩] হামযাহ্‌র ইসলাম কবুলের এই ঘটনাটি ছিল আকস্মিক এবং ভাতিজার প্রতি ভালবাসার টানে। অতঃপর আল্লাহ তার অন্তরকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য তিনি শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য স্তম্ভরূপে আর্বিভুত হন। হামযাহ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন!

حمدت الله حين هدي فوادي * الي الاسلام والدين الحنيف

لدين جاء من رب عزيز* خبير بالعباد بهم لطيف

اذا تليت رسائله علينا* تحدر دمع ذي اللب الحصيف

رسائل حاء احمد من هداها* بايات مبينة الحروف

‘আমি মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যেহেতু তিনি আমার অন্তরকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং একনিষ্ঠ এক দ্বীনের দিকে আমাকে হেদায়াত দান করেছেন। সেটা এমন এক দ্বীন, যা পরাক্রমশালী প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে। সেই প্রভু স্বীয় বান্দাদের খবর রাখেন এবং তাদের ব্যাপারে অত্যন্ত দয়ালু। যখন তাঁর গ্রন্থ আমাদের নিকট তেলাওয়াত করা হয়, তখন কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তির চোখ থেকে অবিরত ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। যে গ্রন্থ আহমাদ নিয়ে এসেছেন এবং যার আয়াত দ্বারা হেদায়াত করেছেন। এর আয়াত সুস্পষ্ট হরফ (অক্ষর) দ্বারা সন্নিবেশিত।[৪৪]

ইসলাম গ্রহণের পর হামযাহ (রাঃ) অনেক জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। ‘সারিয়াতু হামাযাহ’ সংঘটিত হওয়ার সময় (১ম হিজরীর রামাযান মাসে) ইসলামের সর্বপ্রথম ঝাণ্ডা হামযাহ (রাঃ)-কে প্রদান করা হয়। ‘আবওয়া’র যুদ্ধেও মহানবী (ছাঃ) হামযাহকে নেতা ও ঝাণ্ডাবাহী এবং ‘যুল আশীরা’র যুদ্ধেও তাঁকে ঝাণ্ডাবাহী নিযুক্ত করেছিলেন। বদর যুদ্ধে শায়বাহ মতান্তরে উৎবাহসহ অনেক কুরাইশ নেতা ও সৈন্য তাঁর হাতে নিহত হয়েছিল। ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত বনু কাইনুকার যুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং মহানবী (ছাঃ) এ যুদ্ধেও তাঁকে ইসলামী বাহিনীর পতাকা অর্পণ করেছিলেন। তৃতীয় হিজরীর ৭ই শাওয়াল শনিবার সকালে সংঘটিত ওহোদ যুদ্ধে যুবক হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) শাহাদত বরণ করেন। তাঁর শাহাদতের ঘটনা হল, ওহোদ যুদ্ধে আলী, তালহা, যুবায়ের, সা‘দ বিন আবী ওয়াক্কাছ ও আবু দুজানাহ সহ অন্যান্য জানবায মুসলিম বীরদের মত হামযাহ (রাঃ) যুদ্ধ করছিলেন। এ যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ছিল কিংবদন্তিতুল্য। প্রতিপক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তিনি সিংহ বিক্রমে লড়াই করছিলেন। তিনি দু’হাতে এমনভাবে তরবারি পরিচালনা করছিলেন যে, শত্রুপক্ষের কেউ তাঁর সামনে টিকতে না পেরে সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এদিকে মক্কার নেতা যুবাইর ইবনু মুত্বঈ‘মের হাবশী গোলাম ওয়াহশী বিন হারব একটি ছোট বর্শা হাতে নিয়ে একটি গাছ বা পাথরের আড়ালে ওঁৎ পেতে বসেছিল হামযাহ (রাঃ)-কে নাগালে পাওয়ার জন্য। জুবায়ের তার চাচা তু‘আইমা বিন ‘আদী হত্যার পরিবর্তে ওয়াহশীকে নিযুক্ত করেছিল হামযাহকে হত্যা করার জন্য। আর এর বিনিময়ে তাকে মুক্ত করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল। বদর যুদ্ধে তু‘আইমা হামযাহ (রাঃ)-এর হাতে নিহত হয়েছিল।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে সিবা‘ (سباع) বিন আব্দুল ওযযা হামযার সামনে আসলে তিনি তাতে আঘাত করেন। ফলে তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তিনি সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। এদিকে বর্শা তাক করে বসে থাকা ওয়াহশী সুযোগমত হামযার অগোচরে তাঁর দিকে বর্শা ছুঁড়ে মারে। যা তার নাভীর নীচে ভেদ করে ওপারে চলে যায়। এরপরেও তিনি তার দিকে তেড়ে যেতে লাগলে পড়ে যান এবং কিছুক্ষণ পরেই শাহাদত বরণ করেন।[৪৫] এ যুদ্ধে শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত হামযাহ একাই ৩০ জনের অধিক শত্রু সেনাকে হত্যা করেন।[৪৬] আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিন উৎবাহ বদর যুদ্ধে তার পিতার হত্যাকারী হামযার উপরে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তার বুক ফেড়ে কলিজা বের করে নিয়ে চিবাতে থাকে এবং তাঁর নাক ও কান কেটে কণ্ঠহার বানায়। হামযাহ (রাঃ)- কে ‘সাইয়েদুশ শুহাদা’ শহীদগণের নেতারূপে এবং আসাদুল্লাহ ও আসাদু রাসূলিল্লাহ (আল্লাহর সিংহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের সিংহ) আখ্যায়িত করা হয়।[৪৭] শাহাদতের পর হামযার (রাঃ) বোন ছাফিয়াহ স্বীয়পুত্র যুবাইরকে দু’টি চাদর দিয়ে তাঁর দাফন সম্পন্ন করতে বলেন। কিন্তু এক আনছারীর লাশ তাঁর পাশেই পড়ে থাকতে দেখে আনছারীকে এক চাদরে ও হামযাহকে এক চাদরে কাফন দেয়া হয়। কিন্তু কাপড় এত ছোট ছিল যে, হামযার মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে আসত এবং পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে পড়ত। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশে মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে দেয়া হয় ও পায়ের উপর ইযখির ঘাস চাপিয়ে দেয়া হয় এবং তাঁকে ও তাঁর ভাগ্নে আব্দুল্লাহ বিন জাহশকে একই কবরে ওহোদ প্রান্তরে (শহীদের কবরস্থানে) সমাহিত করা হয়। তাঁর জানাযায় দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ) এমনভাবে কাঁদেন যে শব্দ উঁচু হয়ে যায়।[৪৮] তাঁর সম্পর্কে মহানবী (ছাঃ) বলেছেন,

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ الْبَارِحَةَ فَنَظَرْتُ فِيهَا فَإِذَا جَعْفَرٌ يَطِيرُ مَعَ الْمَلاَئِكَةِ وَإِذَا حَمْزَةُ مُتَّكِئٌ عَلَى سَرِيرٍ

‘আমি গত রাতে জান্নাতে প্রবেশ করে দেখলাম, জা‘ফর ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছেন আর হামযাহ একটি আসনের উপর ঠেস দিয়ে বসে আসেন।[৪৯] সাইয়েদুশ শুহাদা হামযাহ (রাঃ)-এর ত্যাগের প্রতি লক্ষ্য রেখে যুবকদেরকে সমাজ সংস্কারে ও হক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। *(চলবে)*

[লেখক : কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

৪৩. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর রাহীকুল মাখতূম (রিয়ায-দারুল মুআয়্যিদ, ২০০০ খ্রীঃ/১৪২১ হিঃ), পৃ. ১০০-১০১; মাসিক আত-তাহরীক, ১৪/২ নভেম্বর ২০১০, পৃ. ৩; ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, প্রবন্ধ : পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবীর কাহিনী, ২৫/৫ কিস্তি।

৪৪. আস-সীরাতুন নাবাবিইয়াহ, ১ম খণ্ড পৃ. ২৯৩, টীকা দ্রঃ; মাসিক আত-তাহরীক ৩/৬ মার্চ ২০০০ পৃ.২৩।

৪৫. ইমাম যাহাবী, নুযহাতুল কুযালা তাহযীবু সিয়ারু আলামিন নুবালা, (জেদ্দাহ : দারুল আন্দালুস, ১ম প্রকাশ ১৯৯১/১১৪১) ১/৩২-৩৩; আত-তাহরীক ৩/৬, ২০০০, পৃঃ ২৪।

৪৬. আল-ইছাবাহ ২/২৮৬, ক্রমিক সংখ্যা ১১০২, আত-তাহরীক ১৪/৯ জুন ২০১১, পৃঃ ১০।

৪৭. আত-তাহরীক ১৪/১০, জুলাই, পৃঃ ৫।

৪৮. ইবনুল জাওযী, আল-মুনতামাম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম, (বৈরূত : দারুল কুতুব আল ইলমিইয়াহ, তাবি, ৩/১৮২-৮৩ পৃঃ, আত-তাহরীক ৩/৬ মার্চ ২০০০) পৃ: ২৪; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ ঃ ২৮১।

৪৯. আল-মুস্তাদরাকে আলাছ ছহীহায়ন, মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ আল-হাকিম আননিসাপুরী, বৈরূত ঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪১১/১৯৯০) হা/৪৮৯০; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৩৬৩, সনদ ছহীহ।

সোনামণি সংগঠন : বাস্তবায়নের পদ্ধতি

-মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৬. সোনামণিদের নিয়মিত উৎসাহিকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা :

সোনামণি তথা শিশু-কিশোরগণ সর্বদা কল্পনার জগতে থাকে। তাদেরকে বড়দের মত সাধারণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা যায় না। তাদের হৃদয় স্পন্দন খুব বেশী। তারা নতুন নতুন স্বপ্ন দেখে এবং চিত্তপটে হাযারো কল্পনা আঁকে। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, আমাদের অনেক বড় বড় দায়িত্বশীলগণও সোনামণি প্রশিক্ষণে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হন। তাই কল্পনা প্রবণ ও স্বপ্নাশ্রয়ী শিশু-কিশোরদের মনের খোরাক যোগাতে 'সোনামণি' সংগঠন উদ্ভাবন করেছে এক অভিনব কৌশল। সোনামণিদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিতকরণের নিমিত্তে 'সোনামণি' সংগঠন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পাশাপাশি ইসলামী জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, মেধা পরীক্ষা (অংক, ইংরেজী ও বাংলা), কবিতা, সংলাপ, উপদেশমূলক গল্প এবং বিজ্ঞানকে সিলেবাসভুক্ত করেছে। যার মাধ্যমে সোনামণিদের মেধা ও মননের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এতে তাদের সুপ্ত মেধা বিকশিত হবে এবং সকলের কাছে তারা আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। এর মাধ্যমে সোনামণিরা লেখাপড়ার সাথে সাথে এসব কাজে অনেক তৃপ্তি ও আনন্দ পাবে। আর গার্ডিয়ানরাও এ সংগঠনের প্রতি উৎসাহিত হবে ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ। ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান আল্লাহ্‌র দেওয়া বিশেষ নে'মত ও অনুগ্রহ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.

'আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের থেকে তোমাদের জোড়া এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্রদের। আর রিযিক দিয়েছেন তোমাদের উত্তম বস্তু থেকে। তবুও কী তারা বাতিলকে বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ্‌র নে'মত অস্বীকার করবে' *(নাহল ১৬/৭২)*। সুতরাং সন্তান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশ্বমানবতার জন্য এক বিশেষ দান ও পৃথিবীর সৌন্দর্যের প্রতীক। সোনামণিরা নিষ্পাপ ফুলের মত পবিত্র। তাই তাদেরকে নিজ মন থেকে আদর ও স্নেহ করা এবং ভালবাসা উচিৎ। আসুন! আমরা সকলে মিলে সোনামণিদেরকে উৎসাহিতকরণের এ সুযোগ প্রদান করি। আমরা জানি, সুবচনে ভালবাসা, বিনয়ে মর্যাদা, হাসিমুখে আনুগত্য, ত্যাগে নেতৃত্ব আর অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্ব টেনে আনে।

♦ সোনামণিদের আয়ত্ব আনার কৌশল :

সোনামণিদের খেলাধুলার মাধ্যমেও সুন্দরভাবে একটি প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। শিশু-কিশোর তথা সোনামণিদের আয়ত্বে আনার কৌশল :

(১) সালাম ও মুছাফাহা করা, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করা।[৫০]

(২) বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও আদর স্নেহ করা।[৫১]

(৩) লেখা-পড়া, পরিবার-পরিজন ও ইসলামী কাজের খোজ-খবর নেওয়া।[৫২]

(৪) হালকা নাস্তাসহ সার্বিক সহযোগিতা করা।[৫৩]

(৫) বৈধ পন্থায় রসিকতা করা ও সুন্দর গল্প বলা।[৫৪]

(৬) পরিশেষে সংগঠনের দাওয়াত দেওয়া *(মায়িদা ৫/৬৭)*। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৫৫] আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ নয়।[৫৬] তাই আসুন! আমরা সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ এভাবে ধীরে ধীরে 'সোনামণি' সংগঠনকে বাস্তবায়ন করি এবং তাদের কাছে এ সংগঠনকে আকষর্ণীয় করে তুলি। 'সোনামণি' সংগঠনের মূল শ্লোগানটি তাদেরকে বুঝিয়ে দিই।

'এসো হে সোনামণি।
রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেকে গড়ি'।

৭. যথাযথ ইসলামী জ্ঞানার্জনে সর্বদা সচেষ্ট থাকা :

যে কোন সংগঠন পরিচালনার জন্য দায়িত্বশীলদেরকে ইসলামী জ্ঞানের পাশাপাশি বিশেষ কিছু জ্ঞানার্জন করা অপরিহার্য। পবিত্র কুরআনের প্রথম নাযিলকৃত শব্দ ছিল জ্ঞানার্জন করা। মহান আল্লাহ চান তার সুন্দরতম সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করুক। এ জন্য তিনি নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে পথ নির্দেশনা দিয়েছেন এই মর্মে যে, 'সকল জ্ঞানের উৎস একমাত্র আল্লাহ' *(আহকাফ ৪৬/২৩)*। আর এ জন্যই তো স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও সংগঠন।

সোনামণিদের জ্ঞানার্জন মূলতঃ ৩ ভাবে হয়ে থাকে। যথা : (১) পড়াশুনা করে (২) দেখে ও ঠকে এবং (৩) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। ১ ও ২ নং জ্ঞানার্জন অনেকের পক্ষে সম্ভব কিন্তু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন সংগঠন ছাড়া সম্ভব নয়। তাই তো সংগঠনের এত গুরুত্ব ও প্রয়োজন। নিয়মিত ইসলামী বই, পত্রিকা, পাঠাগার ইত্যাদির মাধ্যমেও জ্ঞানার্জন করা যায়। 'সোনামণি' সংগঠনের জন্য সোনামণিদের উপযোগী কিছু জ্ঞানার্জন করা একান্ত প্রয়োজন। সোনামণিদের সাথে খারাপ আচরণ ও বদমেজাজে ও রাগ করলে তারা সংগঠন থেকে সরে পড়বে। সোনামণিদের সাথে সর্বদা মুচকি হাসি দিয়ে কথা বলতে হবে। কারণ মুচকি হাসি পাথরকেও মোমের মত গলিয়ে দেয়।

---

৫০. বুখারী, মিশকাত হা/৪৬৩৬।
৫১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৩।
৫২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৩।
৫৩. বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/৪৯৪৭।
৫৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮৮৪।
৫৫. তিরমিযী, আলবানী হা/১৯১৯।
৫৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৩।

সোনামণিদেরকে এক একজন ভাল বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে তাদেরকে ইসলাম ও সংগঠন শেখাতে হবে। আল্লাহ বলেন, لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ 'মুমিনগণ যেন মুমিন ছাড়া কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে' *(আলে ইমরান ৩/২৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সে ব্যক্তি তার সঙ্গে থাকবে, সে যাকে ভালবেসেছে'।[৫৭] রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয'।[৫৮] তিনি আরও বলেন, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তিনি তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন'।[৫৯] আমাদের উচিৎ ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির স্বার্থে এবং দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য 'সোনামণি' সংগঠন বাস্তবায়নে দায়িত্বশীলদের বিশেষ জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ভূমিকা পালন করা। আর জ্ঞানার্জনকে সংগঠন বাস্তবায়নের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা সকলের একান্ত কর্তব্য।

সোনামণি করব, জীবনটাকে গড়ব।

৮. দায়িত্বশীদের সাংগঠনিক গুণাবলী অর্জন করা :

দলবদ্ধভাবে এক সাথে মিলেমিশে কাজ করাকে সংগঠন বলে। সংগঠন সাধারণত দু'প্রকার। যথা : (১) নিয়মতান্ত্রিক এবং (২) অনিয়মতান্ত্রিক। সংগঠনের মৌলিক ৫টি বৈশিষ্ট রয়েছে। যেগুলো যে সংগঠনের মধ্যে আছে, সেটি নিয়মতান্ত্রিক এবং যার মধ্যে নেই, সেটি অনিয়মতান্ত্রিক সংগঠন। ৫টি বৈশিষ্ট হ'ল- (১) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মূলমন্ত্র (২) নেতা (৩) কর্মী (৪) অর্থ (৫) ক্ষেত্র। আমাদের 'সোনামণি' সংগঠন সহ এ ৫টি বৈশিষ্ট সকল সংগঠনের মধ্যে বিদ্যমান। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ 'আল্লাহ কোমল, তিনি কোমলতাকে ভালবাসেন'।[৬০]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الإِيمَانِ وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ 'লজ্জা ও কম কথা বলা ঈমানের দু'টি শাখা আর অশালীন ও অসার কথা বলা মুনাফিকের দু'টি শাখা'।[৬১] আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ '(মুমিনদের পরিচয়ে) 'যারা আসার ক্রিয়াকলাপ হ'তে বিরত থাকে' *(মুমিনূন ২৩/৩)*। অতএব দায়িত্বশীল হবে তারাই, যাদের মধ্যে আল্লাহভীতি রয়েছে। একদা রাসূল (ছাঃ) এক ছাহাবীকে বলেন, أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَىْءٍ 'আমি তোমাকে তাক্বওয়া অর্জনের অছিয়ত করছি। কারণ তাক্বওয়া সকল কিছুর মুকুট'।[৬২] তাক্বওয়ার কারণে আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই *(তালাক্ব ৬৫/৩)*।

ধৈর্য একটি বিশেষ গুণ। ধৈর্যহীন মানুষ মহৎ হতে পারে না, সফলতার শীর্ষে আরোহন করতে পারে না। সংগঠনের দায়িত্বশীলদের চরম ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়। এই কারণে হয়তোবা মহান আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন *(আলে ইমরান ৩/১৪৬)*। حُرِّمَ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيبٍ مِنَ النَّاسِ 'ঐ ব্যক্তির উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়, যার মেযাজ নরম স্বভাবের ও কোমল, মানুষের সাথে মিশুক প্রকৃতির এবং তার চরিত্র সহজ ও সরল'।[৬৩] জারীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ 'যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাকে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়'।[৬৪] আব্দুল্লাহ ইবনু হারেছ ইবনে জাযই (রাঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 'আমি রাসূল (ছাঃ)-এর চেয়ে অন্য কাউকে অধিক মুচকি হাসি হাসতে দেখিনি'।[৬৫] 'সোনামণি' সংগঠনের বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে এসব গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী অর্জন করা প্রত্যেক দায়িত্বশীলের জন্য অপরিহার্য।

৯. নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা :

প্রশিক্ষণ শব্দের অর্থ হচ্ছে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া। সারা বছর লেখাপড়া করে কোন সন্তান যা শিখতে পারে না, কয়েক ঘন্টার প্রশিক্ষণে সে তা শিখতে পারে। শাখা পর্যায়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর, যেলা/মহানগর পর্যায়ে প্রতি বছর এবং কেন্দ্রীয়ভাবে বার্ষিক প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা বাঞ্চনীয়। এর মাধ্যমে সংগঠনের প্রসার ঘটে ও পরিচিত লাভ করে এবং সোনামণিরাও পায় প্রচুর আনন্দ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 'তোমরা ভালকাজে ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না' *(মায়েদা ৫/২)*।

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে `Training is learning designed to change the performance of the people doing job'. 'প্রশিক্ষণ হচ্ছে এমন এক শিক্ষণ পদ্ধতি, যা মানুষের ধারাবাহিক কাজের গতিধারার পরিবর্তন এনে দেয়'। প্রশিক্ষণের নীতিমালা ৭টি। যথা : (১) সময়মত উপস্থিত হওয়া। (২) খাতা ও কলম সঙ্গে আনা (৩) মনোযোগী হওয়া (৪) প্রয়োজনীয় বিষয় নোট করা (৫) অনুমতি নিয়ে বাইরে যাওয়া (৬) শৃংঙ্খলা বজায় রাখা (৭) দো'আ পাঠের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শেষ করা। এভাবে নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মী, দায়িত্বশীল, নেতা ও সোনামণিদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং মনোবল বৃদ্ধি পায়। ফলে সকল বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করে থাকে। ইসলামের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পর্যায়ক্রমে প্রতিযোগিতার মাধ্যমেও 'সোনামণি' সংগঠনের বাস্ত বায়ন সম্ভব। এ দু'টি বিষয়ে 'সোনামণি' সংগঠনের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের বিশেষ নযর দেওয়া ও ভূমিকা রাখা একান্ত প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট এলাকার গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের স্কুল-মাদরাসা ও কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের এবং জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। বিশেষ করে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী সোনামণিদের পুরস্কার প্রদানের জন্য এর

---

৫৭. তিরমিযী হা/২৩৮৫, সনদ ছহীহ।
৫৮. ইবনু মাজাহ হা/২২৪, মিশকাত হা/২১৮, সনদ ছহীহ।
৫৯. বুখারী হা/৭১, মিশকাত হা/২০০।
৬০. মুসলিম. মিশকাত হা/৫০৬৮।
৬১. তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৭৯৬, সনদ ছহীহ।
৬২. আহমাদ হা/১১৭৯১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৫৫, সনদ ছহীহ।
৬৩. আহমাদ হা/৩৯৩৮; ছহীহুল জামে' হা/৫৪৪৬, সনদ ছহীহ।
৬৪. মুসলিম হা/৬৭৬৩; মিশকাত হা/৫০৬৯।
৬৫. তিরমিযী হা/৩৬৪১, মিশকাত হা/৪৭৪৮, সনদ ছহীহ।

মাধ্যমে আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। ‘সোনামণি’ সংগঠনের ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও বাস্তবায়নের স্বার্থে সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। আসুন আমরা সকলে মিলে এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করি।

১০. সোনামণি সংগঠনের সাথে অন্যান্য শিশু-কিশোর সংগঠনের পার্থক্য সম্পর্কে জানা :

‘সোনামণি’ সংগঠন ছাড়াও বাংলাদেশে আরও প্রায় ২০/২২টি শিশু-কিশোর সংগঠন আছে। এসব শিশু-কিশোর সংগঠনের অনেকগুলোর কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচী নেই। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এবং আন্তর্জাতিক শিশু-অধিকার দিবস পালন ইত্যাদি ছাড়া এদের তেমন কোন কর্মসূচী দেখা যায় না। সোনামণি সংগঠনের সাথে অন্যান্য শিশু-কিশোর সংগঠনের আদর্শিক ও মৌলিক পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য : শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি ও তদানুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলা।[৬৬] অন্যান্য শিশু-কিশোর সংগঠনের লক্ষ্য হচ্ছে, কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের নেতার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য চেতনা সৃষ্টি ও জীবন ও সমাজ গড়ে তোলা। যেমন- জিয়া শিশু-কিশোর সংগঠন এবং শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন ও কঁচি-কাঁচার মেলা ইত্যাদি।

২. সোনামণি সংগঠনের উদ্দেশ্য : আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।[৬৭] অন্যান্য শিশু-কিশোর সংগঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের নেতার সন্তুষ্টি অর্জনের উপর সীমাবদ্ধ থাকবে। (তাদের কর্মসূচী উপরের উদাহরণ দ্রষ্টব্য)।

৩. সোনামণি সংগঠনের মূলমন্ত্র : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেকে গড়া’ *(আহযাব ৩৩/২১)*। এর স্বপক্ষে পবিত্র কুরআনে আরো অনেকগুলো আয়াত আছে।[৬৮] অন্যান্য শিশু-কিশোর সংগঠনের চরিত্র গঠনের জন্য তেমন কোন ভিত্তি, উপাদান বা মূলমন্ত্র নেই। বাংলাদেশের অন্যতম ইসলামী সংগঠনের জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন ‘ফুল কুঁড়ি’-এর মূলমন্ত্র হচ্ছে ‘নিজেকে গড়া’। কার, কি বা কোন আদর্শ তারা বাস্তবায়ন করবে ইত্যাদি কোন বালাই এর মধ্যে নেই। সুবিধামত সময়ে তারা সুবিধামত যে কোন আদর্শ বা মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করতে পারবে। তাহলে শিশু-কিশোরদের চরিত্র কেমন হবে তা অতি সহজেই বুঝা যায়।

৪. সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মূলমন্ত্র ছাড়াও শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনের জন্য ১০টি গুণাবলী, ৫টি নীতিবাক্য এবং ৪ দফা কর্মসূচীসহ একটি সুনির্দিষ্ট প্লাটফর্ম ও কর্ম-পরিকল্পনা আছে। অন্যান্য শিশু-কিশোর সংগঠনে চরিত্র গঠনের জন্য এমন সুবিবেচনাপূর্ণ প্লাটফর্ম ও কর্ম-পরিকল্পনা নেই।

৫. সোনামণি সংগঠনের প্রত্যেক দায়িত্বশীলদেরকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গঠনের শপথ নিতে হয়। অন্যান্য শিশু-কিশোর সংগঠনের দায়িত্বশীলদেরকে এমন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ব্যতীত শুধুমাত্র কর্মসূচী পালনের শপথ নিতে হয়।

৬. সোনামণি সংগঠনের দায়িত্বশীলদেরকে প্রত্যেকটি কথা, কাজ, সভা-সমাবেশ, বৈঠক এবং আলোচনায় ইসলামী চেতনা ও আদর্শকে যথাযথ অনুসরণ করা ও সমুন্নত রাখা বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য শিশু-কিশোর সংগঠনের এমন কোন পদ্ধতি ও আদর্শ অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক নয়। যেমন- জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন ‘খেলাঘর’-এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে তারা ঢাক-ঢোল, নাচ-গান, নাটক, অভিনয়, ক্রীড়া-কৌতুক ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করে থাকে।

৭. সোনামণি সংগঠন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং আদর্শের উপর ভিত্তি করে আদর্শবান ব্যক্তি, পরিবার, সোনালী সমাজ ও সুশৃংখল দেশ গড়ার নিমিত্তে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর অন্যান্য শিশু-কিশোর সংগঠন তাদের দায়িত্বশীলদের নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনার উপর ভিত্তি করে এগুলো গড়ার নিমিত্তে কাজ করে যাচ্ছে।

৮. সোনামণি সংগঠনের সকল বিধি-বিধান ও নীতিমালা অপরিবর্তনীয় ও দীর্ঘস্থায়ী। পক্ষান্তরে অন্যান্য শিশু-কিশোর সংগঠনের সকল বিধি-বিধান ও নীতিমালা ঘনঘন পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী। সোনামণি সংগঠন ব্যতীত বাংলাদেশের আরো কিছু শিশু-কিশোর সংগঠনের নাম ও পরিচিতি জানার জন্য নিম্নে পেশ করা হল। ১. ফুল কুঁড়ি, ২. আলোর প্রদীপ ফৌজ ৩. শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন ৪. জিয়া জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন ৫. কমল কুঁড়ি ৬. রূপালী তারার মেলা ৭. কঁচি-কাঁচার মেলা ৮. নতুন কুঁড়ি ৯. চাঁদের হাট ১০. খেলা আসর ১১. কেন্দ্রীয় ফুল পাখি ১২. শিশু বন্ধু ১৩. খেলা ঘর ১৪. আবোল তাবোল ইত্যাদি।

সোনামণি সংগঠনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য উল্লেখিত ১০টি গুণাবলী অর্জন সাপেক্ষে মহান আল্লাহর বিশেষ মদদ কামনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সাথে থাকুন এবং সহায় হৌন। আমীন!!

[লেখক : প্রথম পরিচালক, সোনামণি]

বের হয়েছে! বের হয়েছে!!

বযলুর রহমান প্রণীত
কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে
জান্নাত ও জাহান্নাম

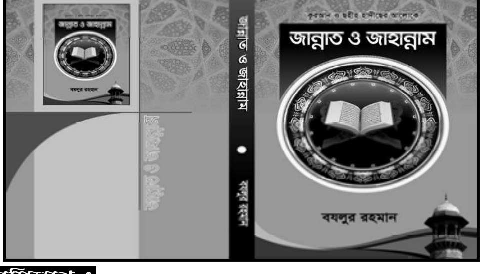

প্রাপ্তিস্থান :
আছ-ছিরাত প্রকাশনী, হাফিয আমেনা প্লাজা, নওদাপাড়া মাদরাসা সংলগ্ন, আমচত্বর, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১, ০১৭৩৮-০২৮৬৯২

---

৬৬. সূরা বাক্বারাহ ২/১১৩; আলে ইমরান ৩/১৫৯।

৬৭. বাইয়েনাহ ৯৮/৭ ও ৮; ফজর ৮৯/২৭-৩০; মায়িদা ৫/১১৯; ত্বহা ২০/১৩০; রা‘দ ১৩/২২-২৪।

৬৮. কলম ৬৮/৪; আম্বিয়া ২১/১০৭; হাশর ৫৯/৭; নজম ৫৩/৩ ও ৪; আলে ইমরান ৩/৩১ ও ৩২, ১৩২-১৩৪,১৫৯; সাবা ৩৪/২৮; নূর ২৪/৫৪; নিসা ৪/৫৯ ও ৮০; ইব্রাহীম ১৪/১; ‘আরাফ ৭/১৯৯; তাগাবুন ৬৪/১২-১৩; ইয়াসিন ৩৬/৩৪।

পবিত্রতা অর্জনের শিষ্টাচার

-বযলুর রহমান

ভূমিকা :

ইসলামী শরী'আতে ত্বাহারাৎ বা পবিত্রতা অর্জন ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পবিত্রতা অর্জন করা মুসলিম জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ 'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক'।[৬৯] ইসলামের পাঁচটি মৌলিক ভিত্তির দ্বিতীয় ও অন্যতম মৌল ভিত্তি হল ছালাত। যা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর আদায় করা ফরয। এই গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত পবিত্রতা অর্জন ছাড়া কবুল হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ 'পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত ছালাত কবুল হয় না এবং হারাম মালের যাকাত কবুল হয় না'।[৭০] মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 'নিশ্চয় আল্লাহ (অন্তর থেকে) তওবাকারী ও বাহ্যিকভাবে পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব এত বেশী যে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মোট ১৮টি সূরায় ২৭ বার এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন।[৭১] 'কুতুবুস সিত্তাহ' তথা হাদীছের প্রসিদ্ধতম ছয়টি গ্রন্থ সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে ত্বাহারাৎ একটি বিরাট অধ্যায় দখল করে আছে। মুহাদ্দিছগণ এই ত্বাহারাৎ সংক্রান্ত হাদীছ সমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত কঠোর সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, যার ঋণ মুসলিম জাতির পরিশোধ করার সাধ্য নেই। আর মহানবী (ছাঃ)-এর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আদব বা পবিত্রতা অর্জনের শিষ্টাচার কেমন ছিল তা উপরোক্ত হাদীছ গ্রন্থ সমূহে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে এ সংক্রান্ত আলোচনা পেশ করা হল-

ত্বাহারাৎ-এর প্রকারভেদ :

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা যরূরী। কারণ সকল ইবাদতের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ'ল পবিত্রতা অর্জন করা। আর এটা দু'প্রকার। যথা : আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বা দৈহিক।[৭২] আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বলতে যাবতীয় শিরকী আক্বীদা, রিয়া, নিফাক্ব, হিংসা, অহংকার, কৃপণতা, শত্রুতা/ঘৃণা, আত্ম-বিদ্বেষ, আত্ম-অহংকার প্রভৃতি থেকে হৃদয়কে পবিত্র রাখা এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসার ঊর্ধ্বে অন্যের ভালবাসাকে হৃদয়ে স্থান না দেওয়া।[৭৩] আর দৈহিক পবিত্রতা বলতে শারঈ পদ্ধতি অনুযায়ী ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুমের মাধ্যমে শরীর, পোশাক ও স্থানের পবিত্রতাকে বুঝায়। দৈহিক পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে যেমন মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায়, তেমনি অভিশপ্ত শয়তানের খারাপ প্ররোচনা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকা যায়।

১. মুসলিম হা/৫৫৬; মিশকাত হা/২৮১, সনদ ছহীহ।
২. বুখারী হা/১৩৫; ছহীহ মুসলিম ১ম খন্ড ১১৯ পৃঃ, হা/৫৫৭।
৩. মুহাম্মাদ ফুয়াদ 'আব্দুল বাক্বী, আল মু'জামুল মুফাহ্হারাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম, (তেহরান, তাবি), পৃঃ ৫৮১ ।
৪. ইবরাহীম মুসত্বফা, আল মু'জামুল ওয়াসীত্ব (দারুদ দা'ওয়াহ ১৯৮৯ খৃঃ/১৪১০ হিঃ) ২/৫৬৮ পৃঃ; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ ৫৬ পৃঃ।
৫. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৫৬ পৃঃ।

মিসওয়াকের শিষ্টাচার

মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম মিসওয়াক। মিসওয়াক বলা হয়, যে কাঠের মাধ্যমে মুখের দাঁত সমূহ ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়।[৭৪] মিসওয়াকের মাধ্যমে মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় এবং দন্ত রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়। মিসওয়াক করা সুন্নাত, যা প্রত্যেক ওযূর পূর্বে করতে হয়।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক ওযূর পূর্বে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম'।[৭৫] তবে অন্য বর্ণনায় على أمتى এর পরিবর্তে علي المومنين শব্দ এসেছে।[৭৬] সুতরাং এটা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটা শুধু মুসলিম উম্মাহর উপর নির্দিষ্ট নয়, বরং সমগ্র বিশ্ব মানবতার উপর পালনীয় এক অভ্যাসগত বিষয়।

মিসওয়াক করার গুরুত্ব ও ফযীলত :

(١) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

(১) হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন ঘুম থেকে উঠতেন তখনই মিসওয়াক করতেন।[৭৭]

(٢) عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

(২) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, মিসওয়াক হল মুখ পরিষ্কারকারী ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের কারণ।[৭৮]

(٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِى السِّوَاكِ.

(৩) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি তোমাদেরকে অধিকহারে মিওসয়াক করার তাগিদ প্রদান করছি।[৭৯]

(٤) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِالسِّوَاك وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَــهُ

৬. 'আওনুল মা'বুদ ১/৪৬ পৃঃ।
৭. মুসনাদে আহমাদ হা/১০১৮৬; বুলূগুল মারাম হা/২৯, ছহীহুল জামে' হা/৫৩১৭, সনদ ছহীহ।
৮. 'আওনুল মা'বুদ ১/৪৬ পৃঃ, হা/৪৬; মুসলিম ১/১২৮ পৃঃ, হা/৬১২।
৯. ছহীহ বুখারী ১/৩৮ পৃঃ, হা/২৪৫; মুসলিম ১/১২৮ পৃঃ, হা/৬১৬-৬১৯; রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন বাড়ীতে প্রবেশ করতেন তখনই মিসওয়াক করতেন, মুসলিম হা/৬১৩,৬১৪।
১০. আহমাদ ইবনু শো'আইব নাসাঈ (২১৫-৩০৩হিঃ), সুনানু নাসাঈ (দেউবন্দ : মাকতাবাতুল আশরাফিইয়াহ, তাবি) ১/৩ পৃঃ, হা/৫, সনদ ছহীহ।
১১. নাসাঈ ১/৩ পৃঃ, হা/৬, সনদ ছহীহ।
* মুসনাদে বাযযার হা/৬০৩, ১/১২১ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২১৩, ৩/২৮৭ পৃঃ; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২১৫, ১/৫১ পৃঃ, সনদ জাইয়িদ।

فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، إِلاَّ صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ.

(৪) আলী (রাঃ) মিসওয়াক করার নির্দেশ দান করতেন এবং বলতেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় বান্দা যখন মিসওয়াক করে ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়, তখন ফেরেশতা তার পিছনে দাঁড়ায়। অতঃপর তার ক্বিরাআত শুনতে থাকে এবং তার কিংবা তার কথার নিকটবর্তী হয়। এমনকি ফেরেশতার মুখ তার মুখের উপর রাখে। তার মুখ থেকে কুরআনের যা বের হয়, তা ফেরেশতার পেটে ভিতর প্রবেশ করে। অতএব তোমরা কুরআন তেলাওয়াতের জন্য মুখ পরিষ্কার কর।* ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, بِتُّ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ فَاسْتَنَّ 'আমি একদা নবী (ছাঃ) এর নিকট রাত্রী যাপন করেছিলাম, তখন তিনি মিসওয়াক করেন'।[৮০] মিসওয়াক মানুষের স্বভাবজাত আচরণেরও একটি অংশ।[৮১] উল্লেখ্য যে, এটি শুধু মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাত নয়। বরং পূর্ববর্তী সকল আম্বিয়ায়ে কেরামেরও সুন্নাত ছিল।[৮২] আবু সালামাহ (রাঃ) বলেন, আমি যায়েদ ইবনু খালেদকে দেখেছি যে, মিসওয়াক তাঁর কানে থাকত যেরূপ লেখক তার কলম কানে রেখে থাকে। অতঃপর যখনই তিনি ছালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখনই মিসওয়াক করতেন।[৮৩]

মিসওয়াক করার পদ্ধতি ও উপকরণ ঃ

ইমাম নববী (রহঃ) (৬৩১-৬৭৬ হিঃ) বলেন,

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَاكَ يَعُوْدُ مِنَ أَرَاكٍ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُبْدَأَ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ فَمِهِ عَرَضًا لَا طَوْلًا لَئَلَّ يَدْمِيُ لَّحْمِ إِسْنَانِهِ.

'আরাক[৮৪] গাছের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করা মুস্তাহাব। অতঃপর স্বাভাবিকভাবে মুখের ডান দিক থেকে মিসওয়াক আরম্ভ করা, যাতে দাঁতের গোড়ার মাংসপেশী থেকে রক্ত বের না হয়'।[৮৫]

১. মিসওয়াক করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা :

মিসওয়াক করলে দাঁতের ময়লা, রোগ-জীবাণু ও দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসে সজীবতা ফিরে আসে। দাঁত মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে তা শুভ কাজের অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক শুভ কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতেন ও বলার জন্য উৎসাহিত করতেন।

(১) عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَثَرَتْ دَابَّتُ فَقُلْتُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُوْنَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُوْلُ بِقُوَّتِي وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّ يَكُوْنَ مِثْلَ الذُّبَابِ.

(১) আবুল মালীহ একজন ছাহাবী হ'তে বর্ণনা করেন, ছাহাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাহনের পিছনে ছিলাম। তাঁর বাহনটি হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ল। আমি বললাম, শয়তান অসুস্থ হয়ে পড়েছে অথবা শয়তান ধ্বংস হয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, শয়তান অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলবে না। কারণ তুমি যদি এরূপ বল, তবে সে নিজেকে বড় ভাববে; এমনকি বাড়ির আকৃতির ন্যায় (বড়) হয়ে যাবে এবং বলবে যে, আমার শক্তির দ্বারাই এরূপ ঘটেছে। তবে 'বিসমিল্লাহ' বল। কারণ এর ফলে সে নিজেকে ছোট ভাববে; এমনকি সে মাছির ন্যায় (ছোট) হয়ে যাবে'।[৮৬]

(২) عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَطْفِ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَلَوْ بِعُوْدٍ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ.

(২) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'বিসমিল্লাহ' বলে তোমার দরজা বন্ধ কর। কারণ শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। 'বিসমিল্লাহ' বলে বাতি নিভিয়ে দাও। একটু কাঠখড়ি হলেও আড়াআড়িভাবে রেখে 'বিসমিল্লাহ' বলে পাত্রের মুখ ঢেকে রাখ এবং পানির পাত্র ঢেকে রাখ'।[৮৭] উপরোক্ত হাদীছ দু'টি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'বিসমিল্লাহ' বললে শয়তান অপমানিত হয় এবং মাছির ন্যায় ছোট হয়ে যায়। ফলে সে আর ক্ষতি করতে পারে না। এছাড়া প্রত্যেক কাজের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতের উপর বিসমিল্লাহ বলার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং বিসমিল্লাহ বলে মিসওয়াক শুরু করা উচিৎ ।

২. ডান দিক দিয়ে শুরু করা :

ডান দিক ইতিবাচক ইঙ্গিতের পরিচয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিসওয়াকসহ প্রত্যেক ভাল কাজ ডান দিক দিয়ে আরম্ভ করতে ভালবাসতেন।[৮৮] অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدُؤُوابِأَيْمَانِكُمْ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা পোশাক পরিধান করবে অথবা ওযু করবে তখন ডান দিক থেকে আরম্ভ করবে।[৮৯] সুতরাং ডান দিক থেকে মিসওয়াক শুরু করা সুন্নাত।

৩. মাড়ির দাঁতের উপর এবং দুই ঠোঁট উঁচু করে সম্মুখের দাঁতগুলো ভালভাবে পরিষ্কার করা :

শক্তিশালী মাড়ি ও সুস্থ দাঁতের জন্য মাড়ির দাঁতগুলো সুন্দর করে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। আবু মূসা আল-আশ'আরী

---

১২. বুখারী ১/৩৮ পৃঃ।

১৩. عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِب وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ -মুসলিম হা/৬২৭; আবুদাঊদ হা/৫৩; ইবনু মাজাহ হা/২৯৩; তিরমিযী হা/২৭৫৭; মিশকাত হা/৩৭৯, সনদ ছহীহ।

১৪. السنة القديمة للأنبياء السابقين -আওনুল মা'বুদ ১/৫৩ পৃঃ।

১৫. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِى الْمَسْجِدِ وَإِنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعُ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ فَكُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ اسْتَاكَ -আবুদাঊদ হা/৪৭, সনদ ছহীহ।

১৬. দীর্ঘ কান্ড বিশিষ্ট কাঁটাদার বৃক্ষ, আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াভী, অনুবাদ : হাবীবুর রহমান নদভী, মিসবাহুল লুগাত (আরবী বাংলা), (থানবী লাইব্রেরী, ৫৯ চকবাজার, ঢাকা ১৪২৪ হিঃ/২০০৩ খৃঃ) ৯ পৃঃ।

১৭. 'আওনুল মা'বুদ ১/৪৬ পৃঃ, 'মিসওয়াক করা' অনুচ্ছেদ-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৮. আবুদাঊদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস-সাজাস্তা-নী (২০২-২৭৫হিঃ), সুনানু আবীদাঊদ (দেউবন্দ : মাকতাবাতুল আশরাফিইয়াহ তাবি) ২/৬৮০ পৃঃ, হা/৪৯৮২, সনদ ছহীহ।

১৯. আবুদাঊদ ২/৫২৪ পৃঃ, হা/৩৭৩১; বুখারী ১/৪৬৩-৪৬৪ পৃঃ, হা/৩২৮০, সনদ ছহীহ।

২০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০০।

২১. মুসনাদে আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০১, সনদ ছহীহ।

(রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর জিহ্বার উপর মিসওয়াক করতে দেখেছি।[৯০] এ মর্মে অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِى وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَكِلاَهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ قُلْتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا أَطْلَعَانِى عَلَى مَا فِى أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ.

'আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এলাম। আমার সাথে আশ'আর গোত্রের দু'জন লোক ছিল। তারা একজন আমার ডান পাশে আর অন্যজন আমার বাম পাশে ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিসওয়াক করছিলেন। তারা উভয়ই কোন কাজের জন্য প্রার্থনা করল। আমি তখন বললাম, সেই সত্তার কৃসম! যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন, তাদের অন্তরে কী ছিল তা আমাকে অবগত করেনি আর আমি বুঝতেও পারিনি যে, তারা কাজ চাইবে। একপর্যায়ে আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, মিসওয়াক তাঁর ঠোঁটকে উঁচু করে রেখেছে'।[৯১]

৪. হাত দিয়ে জিহ্বা ভালভাবে রগড়ানো :

দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করার জন্য হাত দিয়ে দাঁতের চারপাশে ও জিহ্বার উপর ভালভাবে রগড়াতে হবে। যাতে কোন জীবাণু ও ময়লা থাকতে না পারে।

عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُولُ أُعْ أُعْ وَالسِّوَاكُ فِى فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ.

'আবু বুরদাহ (রাঃ) তাঁর পিতা আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, একবার আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে তাঁকে হাত দিয়ে মিসওয়াক করা অবস্থায় পেলাম। তিনি এমন করে আ' আ' শব্দ করছিলেন মনে হচ্ছিল যেন তিনি বমি করছেন।[৯২] আবু মূসা (রাঃ) বলেন, আমি তাকে জিহ্বার উপর মিসওয়াক করতে দেখেছি।[৯৩]

৫. ঘুম থেকে উঠে প্রত্যেক ওযূর পূর্বে মিসওয়াক করা :

ঘুমন্তাবস্থায় মুখে জমে থাকা জীবাণুগুলো বেশী আক্রমণ করে থাকে। ফলে দন্তক্ষয় রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই দন্তক্ষয়রোধ করার জন্য প্রত্যহ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে মিসওয়াক বা ব্রাশ করা যরূরী। সাথে সাথে মুখের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ওযূর পূর্বে মিসওয়াক করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টদায়ক মনে না করতাম তাহ'লে প্রত্যেক ওযূর পূর্বে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।[৯৪]

২২. মুসলিম হা/৬১৫; নাসাঈ ১/২ পৃঃ, হা/৩।
২৩. নাসাঈ ১/২-৩ পৃঃ, হা/৪; মুসলিম হা/৪৮২২, সনদ ছহীহ।
২৪. বুখারী ১/৩৮ পৃঃ, হা/২৪৪; নাসাঈ ১/২ পৃঃ, হা/৩; 'আওনুল মা'বুদ ১/৫০-৫১ পৃঃ, হা/৪৯।
২৫. মুসলিম হা/৬১৫; 'আওনুল মা'বুদ ১/৫০-৫১ পৃঃ, হা/৪৯; নাসাঈ ১/২ পৃঃ, হা/৩।
২৬. মুসনাদে আহমাদ হা/১০১৮৬; বুলূগুল মারাম হা/২৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৩১৭, সনদ ছহীহ।

৬. কমপক্ষে দুই/তিন মিনিট ধরে মিসওয়াক করা :

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বশেষ গবেষণা অনুযায়ী সুস্থ দাঁত ও শক্তিশালী মাড়ির জন্য প্রয়োজন কমপক্ষে দুই/তিন মিনিট ধরে সুন্দর করে মিসওয়াক করা। কারণ স্বল্প সময়ের জন্য মিসওয়াক করলে দাঁতের জীবাণু দূরীভূত হয় না। ফলশ্রুতিতে দাঁতের উপর জীবাণু বাসা বাঁধে, দাঁতের ক্ষয়রোগ বৃদ্ধি পায় ও মাড়ির পাশে পাথর জমে মুখের দুর্গন্ধ বৃদ্ধি করে। যা মানুষকে কষ্ট দেয় এবং দাঁতও অবিলম্বে নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং মিসওয়াক বা ব্রাশ করার সময় কমপক্ষে দুই/তিন মিনিট সময় ক্ষেপন করতে হবে, যা স্বাস্থের জন্য উপকারী।[৯৫]

৭. শেষে মিসওয়াক ধুয়ে ফেলা এবং আল-হামদুলিল্লাহ বলে শেষ করা :

দাঁত পরিষ্কার করার পর ব্যবহৃত মিসওয়াকটি সুন্দর করে ধুয়ে ফেলতে হবে যেন ময়লা-আবর্জনা না থাকে।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ نَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَيُعْطِيْنِي السِّوَاكَ لأَغْسِلَهُ فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكَ ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ.

'আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মিসওয়াক করার পর তা পরিষ্কার করার জন্য আমাকে দিতেন। অতঃপর আমি প্রথমে তা দিয়ে মিসওয়াক করতাম তারপর পরিষ্কার করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ফিরিয়ে দিতাম।[৯৬] পরিশেষে আল-হামদুলিল্লাহ বলে মিসওয়াক করার পর্ব সমাপ্তি করতে হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا.

'আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বান্দা খাদ্য খেয়ে অথবা পানি পান করে আল-হামদুলিল্লাহ বললে আল্লাহ খুশি হন।[৯৭] সুতরাং প্রত্যেকের উচিৎ মিসওয়াকের পরে আল-হামদুলিল্লাহ বলা।

৮. ছিয়াম অবস্থায় মিসওয়াক করা :

মুসলিম সমাজে একটা ভুল প্রথা চালু আছে যে, ছিয়াম অবস্থায় মিসওয়াক করলে ছিয়াম নষ্ট হয়ে যায়। অথচ উক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বরং কাঁচা হোক শুকনা হোক যেকোন ডাল বা পেস্টযুক্ত ব্রাশ দ্বারা মিসওয়াক করা যাবে। 'আমের ইবন রাবী'আ (রাঃ) বলেন, رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ أُحْصِى أَوْ أَعُدُّ 'আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে ছিয়াম অবস্থায় অসংখ্যবার মিসওয়াক করতে দেখেছি'।[৯৮] জাবের ও যায়েদ ইবনু খালেদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ছিয়াম অবস্থায় বা ছিয়াম অবস্থায় নয় এরূপ অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি।[৯৯] ওছমান (রাঃ)ও এদু'টির মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি।[১০০] *(চলবে)*

২৭. চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখগহবরের যন্ত্রসমূহের পিড়া ও তাহার চিকিৎসা, ডঃ অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় (১৬৫ বিপিনাহিয়ী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০১২, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৫ বৈশাখ) ২৮৭ পৃঃ।
২৮. 'আওনুল মা'বুদ ১/৫২ পৃঃ, হা/ ৫১; মিশকাত হা/৩৮৪, সনদ হাসান।
২৯. তিরমিযী হা/১৮১৬; মুসনাদে আহমাদ হা/১২১৮৯; ছহীহুল জামে' হা/১৮১৬, সনদ ছহীহ।
৩০. ছহীহ বুখারী ১/২৫৯ পৃঃ, 'ছিয়াম' অধ্যায়-৩০, 'ছিয়াম অবস্থায় কাঁচা বা শুকনো মিসওয়াক ব্যবহার করা' অনুচ্ছেদ-২৭।
৩১. প্রাগুপ্ত।
৩২. قَالَ فِيهِ مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ صَائِمٍ وَمُفْطِرٍ-ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহঃ), ফাৎহুল বারী শারহ ছহীহ বুখারী (বৈরূত : দারুল মা'আরিফ, ১৩৭৯ হিঃ), ৪/১৫৮ পৃঃ।

শিরক ও তার ভয়াবহ পরিণতি

-ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর

ভূমিকা :

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রবহমান পাপ সমূহের মধ্যে শিরক সর্বাপেক্ষা বড় পাপ হিসাবে স্বীকৃত। শিরকের চেয়ে জঘন্য কোন পাপ নেই। অন্যান্য পাপ মহান আল্লাহ সহজেই মাফ করে দেন। কিন্তু শিরকের পাপ সহজে মাফ করেন না। শিরকের অপরাধের জন্য বিনয়-নম্রতার সাথে তওবা করতে হয়। শিরককে কাবীরা গুনাহ সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় কাবীরা গুনাহ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আব্দুর রহমান ইবনু আবুবকর তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ছিলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় তিনটি পাপের কথা বলব কী? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা'।[১০১] শিরক এক অমার্জনীয় অপরাধ। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি যদি আমার নিকট যমীন ভর্তি পাপ নিয়ে আস, আর শিরক মুক্ত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ কর। তাহলে আমি ঐ যমীন ভর্তি পাপ ক্ষমা করে দিব'।[১০২] তাই বুঝা যায়, শিরকের মত জঘন্য পাপ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। যার কারণে প্রত্যেক নবী ও রাসূলগণ শিরকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে গেছেন। কোন নবী ও রাসূলকে শিরকের সাথে আপোস করতে দেখা যায়নি। তাঁরা প্রত্যেকে ছিলেন শিরকের সাথে আপোসহীন।

শিরকের শাব্দিক পরিচিতি :

ইবনু মানযুর বলেছেন, 'আশ-শিরকাতু' ও 'আশ-শারকাতু' الشـركة و الشـركة সমার্থবোধক দু'টি শব্দ। যার অর্থ হল, দু'শরীকের সংমিশ্রণ। তিনি আরো বলেন, 'ইশতারাকানা' إشـتركنا 'আমরা শরীক হলাম' শব্দের অর্থ হল, 'তাশারাকানা' تشاركنا 'আমরা পরস্পর শরীক হলাম'। দু'জন শরীক হল আর পরস্পর শরীক হল বা একে অপরের সাথে শরীক হল কিংবা শরীক হওয়া এ সকল শব্দের অর্থ হল, 'আল-মুশারিক' المشارك বা অংশীদার। 'আশ-শিরকু' الشـرك শব্দটিও শরীক করা ও শরীক হওয়ার মতই। এর বহুবচন হল 'ইশরাক' ও শুরাকা-উ' إشرك و شركاء 'সকল শরীকান বা অংশীদার'।[১০৩]

আল-মুনজিদ নামক অভিধানে বলা হয়েছে, أشرك في أمره অর্থাৎ 'তার কাজে সে (অপর কাউকে) শরীক করে নিয়েছে'। أشرك بالله অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে'। আর যে তা করল সে মুশরিক হয়ে গেল।[১০৪]

শেখ যাকারিয়া বলেন, শিরক শব্দমূলটি সংমিশ্রণ ও একত্রিকরণের অর্থ প্রকাশ করে। কোন বস্তুর অংশ বিশেষ যখন একজনের হবে, তখন এর অবশিষ্ট অংশ অপর এক বা একাধিক জনের হবে।[১০৫] যেমন আল্লাহ বলেন, أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ 'তবে কি আকাশমণ্ডলীতে তাদের অংশীদারিত্ব রয়েছে' *(আহক্বাফ ৪৬/৪)*।

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে প্রমাণিত হয় যে, 'শিরক' শব্দটি মূলগতভাবেই মিশ্রণ ও মিলনের অর্থ প্রকাশ করে এবং এ মৌলিক অর্থটি এর সকল রূপান্তরিত শব্দের মধ্যে নিহিত থাকে। আর দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যকার অংশীদারিত্ব যেমন ইন্দ্রিয় অনুভূত বস্তুসমূহের মধ্যে হতে পারে, তেমনি তা কোন অর্থগত বা গুণগত বস্তুতেও হতে পারে।[১০৬]

শিরকের পারিভাষিক পরিচিতি :

ড. ইবরাহীম বরীকান শিরকের পারিভাষিক অর্থ বর্ণনায় বলেন, গায়রুল্লাহকে আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্যের সমকক্ষ করা। সমকক্ষ বলতে এখানে মুক্ত শরীকানা বুঝানো হয়ে থাকে, শরীকানায় আল্লাহ্‌র অংশ গায়রুল্লাহ-এর অংশের সমান হতে পারে অথবা আল্লাহ্‌র অংশ গায়রুল্লাহ-এর অংশের চেয়ে অধিকও হতে পারে।[১০৭]

তিনি শিরকের আরেকটি অর্থ নিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র পাশাপাশি গায়রুল্লাহকে উপাস্য ও মান্যবর হিসাবে গ্রহণ করা। কুরআন, সুন্নাহ ও অগ্রবর্তী মনীষীগণের কথায় শিরক শব্দটি যখন সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন এর দ্বারা শিরকের দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।[১০৮]

মূলতঃ শিরক হচ্ছে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া বা সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করা। অর্থাৎ স্রষ্টা হওয়ার জন্য যে সব গুণাবলী দরকার, সেগুলোর ক্ষেত্রে কোন লোক সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে তুলনা বা সাদৃশ্যপূর্ণ করলে, সে মুশরিক হয়ে যাবে।[১০৯]

---

১০১. ছহীহ বুখারী হা/২৬৬৪, ১/৩৬২ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/২৫৫, ১/৬৪ পৃঃ।

১০২. তিরমিযী হা/৩৫৪০; মিশকাত হা/২৩৩৬, সনদ ছহীহ।

১০৩. ইবনু মানজুর, লিসানুল আরব, الشرك শব্দমূল (১৮০৫ হিঃ), ১০/৪৪৮-৪৫০ পৃঃ।

১০৪. অধ্যাপক আনতুয়ান, আল-মুনজিদ (বৈরুত : দারুল মাশারিক, ২১ তম সংস্করণ, ১৯৭২ খ্রিঃ), পৃঃ ৩৮৪।

১০৫. ড. মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল আলী, শিরক কী ও কেন? (সিলেট : এডুকেশন সেন্টার, ১ম প্রকাশ জুলাই-২০০৭ ইং), পৃঃ ২৯।

১০৬. শিরক কী ও কেন? পৃঃ ৩০।

১০৭. ড. ইব্রাহীম বরীকান, আল-মাদখালু লিদেরাসাতিল 'আক্বীদাতিল ইসলামিয়্যাহ 'আলা মাযহাবি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (আল-খুবাব : দারুস সুন্নাহ লিন নসরি ওয়াত তাওযী, ১৯৯২ ইং), পৃঃ ১২৫।

১০৮. আল-মাদখালু লিদেরাসাতিল 'আক্বীদাতিল ইসলামিয়্যাহ 'আলা মাযহাবি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, পৃঃ ১২৬।

১০৯. মূল : আলী বিন নুফায়ী আল-উলাইয়ানী, অনুবাদ : ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান, আক্বীদার মানদণ্ডে তা'বিয (ঢাকা :

আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করার অর্থ হল- বান্দা কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করে, তার নিকট প্রার্থনা করে, কোন কিছু আশা করে, তাকে ভয় করে, তার উপর ভরসা করে, তার নিকট সুপারিশ চাওয়া, তার নিকট বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য ফরিয়াদ করা, কিংবা তার নিকট এমন বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা, যার সমাধান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারে না, অথবা তার নিকট মিমাংসা চাওয়া, কিংবা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে তার আনুগত্য করা, অথবা তার কাছ থেকে শরী'আতের বিধান গ্রহণ করা কিংবা তার জন্য (বা তার নামে) যবহ করা, অথবা তার নামে মানত করা, অথবা তাকে এতটুকু ভালবাসা যতটুকু আল্লাহকে ভালবাসা উচিৎ।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যে সকল কথা, কাজ ও বিশ্বাসকে ওয়াজিব বা মুস্তাহাবরূপে নির্ধারণ করেছেন, সেগুলোর সব কিংবা কোন একটি গায়রুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে করাই হল শিরক।

শিরকের প্রকারভেদ :

প্রকৃতপক্ষে শিরক তিন ভাগে বিভক্ত। (ক) শিরকে আকবার বা বড় শিরক (খ) শিরকে আছগার বা ছোট শিরক (গ) শিরকে খাফী বা গোপন শিরক।

শিরকে আকবার বা বড় শিরক :

বিশ্বাস জাতীয় বিষয়াদী ও উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক বা সমান করাই মূলতঃ শিরকে আকবার।

আবার কেউ সংজ্ঞা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন, শিরকে আকবার হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শিরক করা। যেমন অন্যকে আহ্বান করা, অন্যের নিকট কিছু কামনা করা, অন্যকে ভয় করা, অন্যকে আল্লাহ্‌র ন্যায় ভালবাসা, অন্যের জন্য পশু উৎসর্গ বা মানত করা।

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্‌র সাথে গায়রুল্লাহকে আহ্বান করাই হচ্ছে শিরকে আকবার।[১১০]

আবার কেউ বলেন, আল্লাহ্‌র উপাসনা সমূহের কোন উপাসনা গায়রুল্লাহ-এর উদ্দেশ্যে করাকে শিরকে আকবার বলা হয়।[১১১]

আল্লাহ তা'আলার নামাবলী ও গুণাবলীর যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যে বৈশিষ্টগুণে তিনি আমাদের একক রব ও উপাস্য, আমাদের রাসূল (ছাঃ) বা কোন অলি-দরবেশ, জিন-পরী বা গ্রহ-তারা, গাছ-পালা ও পাথর ইত্যাদিকে সে সব বৈশিষ্ট্যের কোন না কোন বৈশিষ্ট্যের সমান বা আংশিক অধিকারী বলে মনে করা এবং নবী, অলি, গাছ-পালা ও পাথর ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অন্তর দ্বারা উপাসনামূলক কোন কর্ম করাকে শিরকে আকবার বলা হয়।

এরূপ শিরককারীর পরিণতি হল চিরস্থায়ী জাহান্নাম। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ 'যে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাইকে শরীক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার আবসস্থল হবে জাহান্নাম' *(মায়েদা ৫/৭২)*।

শিরকে আছগার বা ছোট শিরক :

শিরকে আকবার নয় এমন যে সব কর্মকে শরী'আতে সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা শিরক বলে নাম করণ করা হয়েছে, সেগুলোই হচ্ছে শিরকে আছগার। যেমন কেউ বলল, 'আল্লাহ আর আপনি যা চান'। 'আল্লাহ আর আপনি যদি উপস্থিত না থাকতেন, তাহলে আমার মহা বিপদ হয়ে যেত'। অনুরূপভাবে আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে শপথ করা ইত্যাদি।[১১২]

ড. ইবরাহীম বরীকান শিরকের সংজ্ঞায় বলেন, 'আমলের ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলার সমান মনে করাকে শিরকে আছগার বলা হয়'। যেমন কোন কাজে ও কথায় লোক দেখানোর ভাব করা।[১১৩]

ইমাম ইবনুল কৃইয়িম শিরকে আছগারের উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'উপাসনায় লোক দেখানোর ভাব করা, মানুষের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা, আমি আল্লাহ ও আপনার উপর ভরসা করেছি এমনটি বলা, আল্লাহ ও আপনি না হলে এমনটি হত। এ সব উদাহরণ প্রদানের পর তিনি বলেন, শিরকে আছগার কখনো কর্তা ব্যক্তির মানসিক অবস্থা ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিরকে আকবারেও রূপান্তরিত হতে পারে'।[১১৪]

আবার কারো কারো মতে, শিরকে আছগার হল- 'এমন সব কথা বা কাজ, যা বাহ্যিকভাবে গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলার সাথে সমান করে নেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও এই সমকক্ষ বানানোটা কর্তা ব্যক্তির উদ্দেশ্য নয়'।[১১৫]

নিম্নোক্ত উদাহরণ গুলোতে শিরকে আছগারের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। যেমনভাবে মানুষেরা বলে থাকে, আল্লাহ আর এই পোষা কুকুরটি না হলে আজ রাতে আমার বাড়ীতে চুরি হয়ে যেত। আল্লাহ এবং আপনি না হলে আজকে মহা অঘটন ঘটে যেত। আমি মাটি হাতে নিয়ে বা মায়ের নাম নিয়ে বা সন্তানের মাথায় হাত রেখে বা চোখের বা দানা ছুঁয়ে শপথ করে বলছি। আমি আল্লহ্‌র অনুগ্রহে এবং আপনাদের দো'আয় ভাল আছি ইত্যাদি ধরনের কথা বলা। *(চলবে)*

[লেখক : কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, প্রকাশকাল : রামাযান ১৪১৭ হিঃ, ১৯৯৭ ঈসায়ী), পৃঃ ২৫।

১১০. শিরক কী ও কেন?, পৃঃ ৫৮।

১১১. আব্দুল আযীয আল-মুহাম্মাদ আস-সালাম, আল-আসইলাতু ওয়াল আজইবাতিল উছূলিয়্যাতি 'আলাল 'আক্বীদাতিল ওয়া-সিতিয়্যাতি লি ইবনে তাইমিয়্যাহ (২১তম সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রিঃ), পৃঃ ৫৮।

১১২. 'আক্বীদাতিল ওয়াসিতিয়্যা, লে ইবনে তাইমিয়্যাহ পৃঃ ১৭০।

১১৩. ড. ইব্রাহীম বরীকান, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৬।

১১৪. আশ-শায়খ সুলাইমান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মুনী, তাইসীরুল 'আযীযিল হামীদ ফী শরহে কিতাবিত তাওহীদ (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪০২ হিঃ), পৃঃ ৪৫।

১১৫. শিরক কী ও কেন? পৃঃ ৬২।

ইলমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভূমিকা :

দ্বীনী ইলম ছাড়া জাতিকে পথ প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। যখন কোন জাতি অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে, তখনই আল্লাহ ঐ জাতির নিকট একজন নবীকে অহি-র জ্ঞানসহ পাঠিয়েছেন। জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা লুটতরাজ, রাহাজানি, গোত্রকলহ, যেনা-ব্যভিচার সহ যাবতীয় অন্যায় ও পাপ কাজে লিপ্ত ছিল। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওয়াতী যিন্দেগীতে পর্যায়ক্রমে অহি-র জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষদেরকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছিলেন। বর্তমান বিশ্বে সূদ, ঘুষ, খুন, ছিনতাই, ডাকাতি, রাহাজানি, যেনা-ব্যভিচার, হরতাল-অবরোধ, গুম ইত্যাদির জয়জয়কার চলছে। তথাকথিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে মানুষ আজ বিভীষিকার মধ্যে নিমজ্জিত। এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় হল প্রকৃত শিক্ষা। নিম্নে ইলম বা শিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

ইলমের সংজ্ঞা :

‘ইলম’ আরবী শব্দ العلم মাছদার থেকে উৎকলিত। অর্থ الادراك والمعرفة বুঝা, উপলব্ধি করা। পারিভাষিক অর্থ, هو نور يقذفه الله فى قلب من يحبه يعرف به حقائق الاشياء وغوامضها ‘এটা এমন আলো, যা আল্লাহ তাঁর প্রিয় মানুষের অন্তরে ঢেলে দেন। অতঃপর তিনি তা দ্বারা বস্তুর তত্ত্ব ও রহস্য জানতে পারেন’।

`OXFORD dictionary'-তে ইলম বা জ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, `The information, understanding and skills that you gain through education or experience'.

দ্বীনী ইলমের গুরুত্ব :

আল্লাহ কর্তৃক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট জিবরীল মারফত সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশকৃত শব্দ হল, اِقْرَأْ ‘আপনি পড়ুন!’। রাসূল (ছাঃ) তখন বলেছিলেন, مَا أَنَا بِقَارِئٍ ‘আমি পড়তে জানি না’। তখন জিবরীল (আঃ) তাকে জাপটে ধরেছিলেন। এই একই দৃশ্য তিনবার হওয়ার পর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট সূরা ‘আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়।[১১৬] করুণাময় আল্লাহ তা‘আলা রাসূল (ছাঃ)-কে অহি-র জ্ঞান শিক্ষা দেন। সুতরাং আমাদের সমাজ ও দেশ থেকে অন্যায়, অপকর্ম দূর করতে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। ইলম অর্জনের নির্দেশনা স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ‘প্রত্যেক মুসলিমের উপরে জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয’।[১১৭]

১১৬. বুখারী হা/৪৯৫৩

১১৭. ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮, সনদ হাসান।

দ্বীনি ইলম অর্জনের প্রতি আল্লাহর উৎসাহ প্রদান :

মানুষ ইলম অর্জন করবে, সে অনুযায়ী আমল করবে এবং নিজেদের মাঝে ইলম প্রচার করবে এটাই আল্লাহর দাবী। আর এ জন্যই আল্লাহ জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

‘সুতরাং এমন কেন হয় না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল বের হবে, যাতে তারা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করতে পারে। আর যাতে তারা নিজ কওমকে ভয় প্রদর্শন করতে পারে যখন তারা ওদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা সতর্ক হয়’ *(তওবা ৯/১২২)*।

মানুষ অজ্ঞ-মূর্খ হয়ে পৃথিবীতে আসে। আল্লাহ বলেন, عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ‘আমি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছি, যা সে জানত না’ *(‘আলাক্ব ৯৬/৫)*। ইলম বা জ্ঞান দ্বারা ভাল-মন্দ নির্ণয় করা যায়। এর দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সুতরাং আল্লাহ যার মঙ্গল চান এবং যার দ্বারা হক্বের বাস্তবায়ন সম্ভব তাকেই মহামূল্যবান জ্ঞান দান করে থাকেন। যেহেতু জ্ঞানের মালিক আল্লাহ, তাই এই জ্ঞান আল্লাহ যাকে চান তাকে দান করেন। তিনি বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ‘তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত দান করেন এবং যাকে হিকমত দান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয় এবং কেবল বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শিক্ষা গ্রহণ করে’ *(বাক্বারাহ ২/২৬৯)*। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ ‘আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন’।[১১৮]

জ্ঞানী ও মূর্খদের মধ্যে প্রার্থক্য :

ইলম আল্লাহ প্রদত্ত এক অফুরন্ত নে’মত। যা জ্ঞানী ও মূর্খদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ‘বলুন! যারা জানে এবং যারা জানে না তার কি সমান?’ *(যুমার ৩৯/৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ‘বলুন! অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি এক হতে পারে?’ *(রা‘দ ১৩/১৬)*।

মহান আল্লাহ সম্পর্কে যারা সঠিক ধারণা রাখে এবং তার শারঈ বিধি-বিধান পরিপূর্ণভাবে জানে এবং মেনে চলে তারাই প্রকৃত জ্ঞানী। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ‘আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে মূলতঃ আলেমরাই তাঁকে ভয় করে’ *(ফাতির*

১১৮. বুখারী হা/৭১

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ৩৫/২৮)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং ফেরেশতাগণ ও ন্যায়নিষ্ঠ বিদ্বানগণ (সাক্ষ্য প্রদান করেন)। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বুদ নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়' *(আলে ইমরান ৩/১৮)*। তিনি আরো বলেন, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ 'পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় অভিজ্ঞ তারা বলে, আমরা উহার প্রতি ঈমান এনেছি, সবই আমাদের রবের তরফ থেকে এসেছে। সত্য কথা এই যে, কোন জিনিস হতে প্রকৃত শিক্ষা কেবল জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই গ্রহণ করে' *(আলে ইমরান ৩/৭)*।

আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী :

রক্ত সম্পর্ক কিংবা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে কোন ব্যক্তির ওয়ারিছ হওয়া যায়। কিন্তু ইলম এমন একটি মূল্যবান সম্পদ, যে ব্যক্তি তা অর্জন করবে আল্লাহ তাকে নবীদের ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারী বানাবেন। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণাসম্পন্ন ব্যক্তিরা মূলতঃ নবীদের উত্তরাধিকারী। আর উত্তরাধিকার জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

'আলেমরাই নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ দীনার বা দিরহামের উত্তরধিকারী করেন না। বরং তারা ইলমের উত্তরাধিকারী করেন। ফলে যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে বৃহদাংশ গ্রহণ করল।[১১৯] অতএব দ্বীনি ইলম অর্জন করলে নবীদের উত্তরাধিকারী হওয়া যায়।

ইলম অর্জনের মর্যাদা :

ইলম অর্জনের মর্যাদা অত্যধিক। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ যাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন তাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত' *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*। ইলম অর্জনের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাছিল করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন।[১২০] অন্য হাদীছে এসেছে,

১১৯. ইবনু মাজাহ হা/২২৩; ছহীহুল জামে' হা/৬২৯৭, সনদ ছহীহ।
১২০. তিরমিযী হা/২৬৪৬; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; ছহীহুল জামে' হা/৬২৯৮, সনদ ছহীহ।

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِى جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.

আবু উমামা আল-বাহিলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে দু'জন লোকের কথা উল্লেখ করা হল। যাদের একজন আলেম অপরজন আবেদ। তখন তিনি বলেন, আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর। যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণের উপর। তারপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই তার প্রতি আল্লাহ রহমত করেন এবং তার ফেরেশতামণ্ডলী, আসমান-যমীনের অধিবাসী, পিপিলিকা তার গর্তে থেকে এবং এমনকি মাছও কল্যাণের শিক্ষা দানকারীর জন্য দো'আ করেন।[১২১]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ أَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ وَقَصْدٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট অহি প্রেরণ করেছেন এই মর্মে, যে ব্যক্তি ইলম হাছিলের লক্ষ্যে কোন পথ গ্রহণ করবে, তার জন্য আমি জান্নাতের পথ সহজ করে দেব এবং যার দু'চক্ষু আমি অন্ধ করেছি তার বদলে আমি জান্নাত দান করব। আর ইবাদত অধিক করার তুলনায় অধিক ইলম অর্জন করা উত্তম।[১২২] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِى جَوْفِ الْمَاءِ.

'যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা উহা দ্বারা তাকে জান্নাতের কোন একটি পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীর উপর খুশি হয়ে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। এছাড়া আলেমদের জন্য আসমান ও যমীনের সকল অধিবাসী আল্লাহ্র নিকট দো'আ ও প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মধ্যে বসবাসকারী মাছও (তাদের জন্য দো'আ করে)'।[১২৩]

জ্ঞানীদের জন্য করণীয় :

জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই করণীয় হল জানা বিষয়গুলো মানুষের নিকট প্রচার করা। যেমন আল্লাহ তাঁর নবীদের নিকট অহি প্রেরণের পর তা মানুষদের নিকট প্রচারের নির্দেশ দেন। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا

১২১. তিরমিযী হা/২৬৮৫; মিশকাত হা/২১৩, সনদ হাসান।
১২২. মিশকাত হা/২৫৫; ছহীহুল জামে' হা/১৭২৭, সনদ ছহীহ।
১২৩. আবুদাউদ হা/৩৬৪১; মিশকাত হা/২১২; ছহীহুল জামে' হা/৬২৯৭, সনদ ছহীহ।

بَلِّغْتَ رِسَالَتَهُ 'হে রাসূল! পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন তবে আপনি তাঁর পয়গাম পৌঁছালেন না' *(মায়েদা ৫/৬৭)*। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً 'আমার পক্ষ হতে মানুষদের নিকটে পৌঁছে দাও, যদি একটি আয়াতও হয়'।[১২৪] পক্ষান্তরে আলেমরা দ্বীন প্রচারে অবহেলা করলে কিংবা বিরত থাকলে অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ بِهِ أَقْتَابُهُ فَيَدُورُ بِهَا فِى النَّارِ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلاَنُ مَا لَكَ مَا أَصَابَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.

ওসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে করে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে যেমনভাবে গাধা আটা পিষা জাঁতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি আমাদের ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতেন না? সে বলবে, হ্যাঁ। আমি তোমাদের ভাল কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে করতাম না। আর খারাপ কাজের নিষেধ করতাম কিন্তু নিজেই তা করতাম।[১২৫] অতএব আমলবিহীন ইলম ক্বিয়ামতের দিন বড় শাস্তির কারণ হবে। আরবী প্রবাদে রয়েছে, رجل بلا عمل كشجرة بلا ثمر 'আমলবিহীন ব্যক্তি ফলবিহীন বৃক্ষের ন্যায়'। জনৈক আরবী কবি বলেন,

لو كان للعلم شرف من دون التقي* لكان أشرف خلق الله إبليس

'যদি তাক্বওয়াবিহীন ইলমের কোন মর্যাদা থাকত, তবে ইবলীস আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের সেরা বলে গণ্য হত।[১২৬]

ইলম প্রচারে সতর্কীকরণ :

দ্বীনি ইলম প্রচারের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রতিটি বিষয় উপস্থাপনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বিষয়টি কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী, না পরিপন্থী। কোন মনগড়া কথা উপস্থাপন করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ)-এর নামে কোন কথা বৃদ্ধি করা যাবে না। কেননা তিনি হুঁশিয়ারী প্রদান করে বলেন, مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।[১২৭] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ 'যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হতে এরূপ কথা বলে, যা সে মনে করে যে, সেটা অসত্য। সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত'।[১২৮]

ইলম প্রচারে লৌকিকতার কুফল :

ইলম প্রচার হবে একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। এতে কোন প্রকার লৌকিকতা থাকবে না। যদি নিয়ত ঠিক থাকে তাহলেই ইলম প্রচারে নেকী পাওয়া যাবে। নিয়ত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'নিয়তের উপর সকল কাজ নির্ভরশীল'।[১২৯] আরো কঠিন বিষয় হ'ল কোন বিষয় জানার পর প্রচারের সাথে সাথে আমল করতে হবে। নচেৎ ক্বিয়ামতের মাঠে তা বিপদজনক হয়ে দাঁড়াবে। হাদীছে এসেছে,

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعمَهُ، فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ وَعَلَّمْتُهُ فِيكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، إِنَّمَا أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ عَالِمٌ وَفُلَانٌ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ، فَأُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ

'যে ব্যক্তি ইলম শিখেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করত, ক্বিয়ামতের মাঠে তাকে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ প্রথমে তাকে নিজ প্রদত্ত নে'মতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন আর তারও স্মরণ হবে। তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এই সকল নে'মতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তুমি কী করেছ? সে বলবে, আমি ইলম শিখেছি এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি ইলম শিখেছ ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছ এ উদ্দেশ্যে যে, তোমাকে আলেম বলা হবে। আর কুরআন তেলোয়াত করেছ এ উদ্দেশ্যে যে, তোমাকে ক্বারী বলা হবে। আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে। তারপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে। অতঃপর তাকে মুখের উপর ভর করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১৩০]

ইলম নিয়ে অহংকার করার পরিণাম :

আল্লাহ তা'আল সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী। তিনি বলেন, إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়' *(লুকমান ৩১/২৭)*। আর তিনি মানুষকে অতি অল্পই জ্ঞান দান করেছেন। তিনি বলেন, وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا 'তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৮৫)*। আল্লাহ্র জ্ঞান সর্ম্পকে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্র জ্ঞানের পরিসীমা সম্পের্কে খিজির (আঃ) মূসা (আঃ)-কে বলেছিলেন, يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِى وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلاَّ كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِى الْبَحْرِ 'হে মূসা! আমার ও তোমার জ্ঞানের স্বল্পতা আল্লাহ্র জ্ঞানের নিকট সমুদ্রের মধ্যে এই চড়ুইয়ের ঠোঁটের এক ফোটা পানির সমান।[১৩১]

১২৪. বুখারী হা/৩৪৬১; তিরমিযী হা/২৬৬৯।
১২৫. বুখারী হা/৩২৬৭; মিশকাত হা/৫১৩৯।
১২৬. নবীদের কাহিনী, ১/১৩ পৃঃ।
১২৭. বুখারী হা/৩৪৬১
১২৮. মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯
১২৯. বুখারী হা/১, ৫০৭০
১৩০. মুসলিম হা/৫০৩২; হাকেম হা/২৫২৪; মিশকাত হা/২০৫
১৩১. বুখারী হা/৭৪,৭৮

মূসা (আঃ) একদা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, সবচেয়ে জ্ঞানী কে? তিনি বললেন, আমি সবচেয়ে জ্ঞানী। মহান আল্লাহ তাকে সতর্ক করে দিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিকটে অহী প্রেরণ করলেন। দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আমার বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দা রয়েছে, যে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী।[১৩২]

অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক আত্মঅহংকারীকে পসন্দ করেন না' (*নিসা ৪/৩৬*)। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلاَ الْجَعْظَرِىُّ 'অহংকারী ও অহংকারের মিথ্যাভানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না'।[১৩৩] সুতরাং ইলমের অহংকার না করে এর পরিসীমা আল্লাহ্‌র দিকে সোপর্দ করাই উত্তম।

ইলম প্রচারে কৃপণতা করা ও গোপন করার শাস্তি :

ইলম প্রচারের ক্ষেত্রে কৃপণতা করা বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা কোন ব্যক্তি যদি তার অপর কোন ভাইকে কল্যাণকর কোন বিষয় শিক্ষা দেয় অতঃপর সে অনুযায়ী যদি সে আমল করে তাহলে আমলকারীর ন্যায় সেও অনুরূপ নেকী পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ 'যে ব্যক্তি কাউকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দিবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় ছাওয়াব পাবে, যে তার উপর আমল করল। কিন্তু আমলকারীর নেকী থেকে এতটুকুও কমানো হবে না।[১৩৪]

স্মরণ রাখতে হবে যে, ইলম গোপন করা যাবে না। কোন ব্যক্তি যদি ইলম গোপন করে, তার পরিণতি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ 'কোন ব্যক্তিকে তার জানা বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তা যদি সে গোপন করে তাকে ক্বিয়ামতের মাঠে আগুনের বেড়ি পরানো হবে।[১৩৫] ছাহাবীগণ হাদীছ গোপন করাকে অত্যাধিক ভয় করতেন। একদা মু'আয (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সওয়ারীর সাথে ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে ডেকে বললেন, যে ব্যক্তি অন্তর থেকে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই তার জন্য জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে। তখন মু'আয (রাঃ) মানুষদের মাঝে এই উক্তিটি প্রকাশ করতে চাইলে রাসূল (ছাঃ) তাকে নিষেধ করলেন। এ জন্য যে, মানুষ এই বাক্যের উপর নির্ভরশীল হবে। কিন্তু মু'আয (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছটি গোপন হওয়ার ভয়ে বর্ণনা করেছিলেন।[১৩৬]

আল্লাহ্‌র নিকট উপকারী ইলমের প্রার্থনা করা :

আল্লাহ্‌র নিকট ইলমসহ যাবতীয় কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ্‌র নিকট চাওয়ার মাধ্যমে ইলম অর্জিত হলে তা দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই অর্জন করা সম্ভব। আর যদি না চাওয়াতেই ইলম আসে, তা দিয়ে দুনিয়া সম্ভব আখিরাত কখনই অর্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ 'অনেকে বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে দান কর। অথচ তার জন্য পরকালের কোন অংশ নেই' (*বাক্বারাহ ২/২০০*)।

আর এজ্যই নবী রাসূলগণ একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটেই চাইতেন। যেমন ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা করে বলেন, رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর' (*শু'আরা ২৬/৮৩*)। অনুরূপ মুসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي- وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي- وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي- يَفْقَهُوا قَوْلِي 'হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজকে সহজ করে দাও এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে' (*ত্বহা ২০/২৫-২৮*)। আর এরই ধারাবাহিকতায় রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্‌র নিকট উপকারী ইলমের প্রার্থনা করতেন। হাদীছের ভাষায় রাসূল (ছাঃ) প্রতি ফজর ছালাতের পর প্রার্থনা করতেন এ বলে যে , اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রূযী প্রার্থনা করছি'।[১৩৭] সুতরাং আমাদের সকলেরই উচিত একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা।

শিক্ষার্থীদের জন্য করণীয় :

শিক্ষার্থীকে অবশ্যই অধ্যয়নে মনযোগী হ'তে হবে এবং রুটিন মাফিক চলতে হবে। শরীরের প্রতি যত্নবান হতে হবে। জামা-কাপড়, বেডসীট, পড়ার টেবিল ইত্যাদি পরিষ্কার ও গোছালো রাখতে হবে। কোন ছাত্রের স্মৃতি হ্রাস পেলে তার জন্য অতীব যরূরী বিষয় হ'ল স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে তওবা করা। এ বিষয়ে ইমাম শাফেঈর ঘটনা অনস্বীকার্য। ইমাম শাফেঈ তার মুখস্থ না হওয়ার ব্যাপারে স্বীয় শিক্ষককে বলেছিলেন,

شكوت إلى وكيع سوء حفظي- فأرشدني إلى ترك المعاصي

'আমি অভিযোগ করলাম ওয়াকীর (ইমাম শাফেঈর শিক্ষক) নিকটে আমার মুখস্থ না হওয়ার ব্যাপারে, তিনি আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, পাপ কাজ ছেড়ে দাও।[১৩৮]

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকবৃন্দকে জিজ্ঞেস করবে, যা সে বুঝতে পারবে না। এরূপ কাজ আমরা রাসূল (ছাঃ) এবং জিবরীল (আঃ)-এর মধ্যকার প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষা নিতে পারি। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

১৩২. বুখারী হা/৭৪, ১২২
১৩৩. আবুদাউদ হা/৪৮০১, সনদ ছহীহ।
১৩৪. ইবনু মাজাহ হা/২৪০; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৬, সনদ হাসান।
১৩৫. তিরমিযী হা/২৬৪৯; মিশকাত হা/২২৩, সনদ ছহীহ।
১৩৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫
১৩৭. আহমাদ ইবনে মাজাহ,তাবারানী,মিশকাত হা/২৪৯৮
১৩৮. ফাতাওয়ে ইসলাম সাওয়াল জওয়াব, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩২৩০

'অতএব তোমরা যদি না জান, তবে আহলে যিকরের নিকট থেকে জেনে নাও' *(নাহল ১৬/৪৩; আম্বিয়া ২১/৭)*।

শিক্ষার্থীদের বর্জনীয় বিষয় সমূহ :

শিক্ষকদের অবাধ্য হওয়া, তাদের সামনে উচ্চ স্বরে কথা বলা ও রূঢ় আচরণ করা, বড়দের অসম্মান, ছোটদের সাথে খারাপ ব্যবহার, সহপাঠীদের কষ্ট দেওয়া, চুরি-ডাকাতি-ছিনতই-টেন্ডারবাজিসহ যাবতীয় অন্যায় কাজ বর্জন করতে হবে। অপচয়-অপব্যয় থেকে বিরত থাকতে হবে। সেটা সময়, টাকা-পয়সা বা যে কোন বিষয়ে হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا-إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ 'কিছুতেই অপব্যয় কর না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৬-২৭)*। অসৎসঙ্গ ত্যাগ এবং সৎসঙ্গ গ্রহণ করতে হবে, তাতে দুনিয়াতে মঙ্গল এবং আখেরাতে আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাওয়া যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ 'দু'জন ব্যক্তি, যারা পরস্পর ভালবাসে আল্লাহ্‌র জন্য এবং একত্রিত হয় আল্লাহ্‌র জন্য এবং পৃথক হয় আল্লাহ্‌র জন্যই।[১৩৯]

ইলম অন্বেষণে হিংসা :

হিংসা করা মহাপাপ। হিংসা করার পরিণতি ভয়াবহ। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ 'তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা হিংসা মানুষের পূর্ণ আমলগুলো বিনষ্ট করে যেমন আগুন কাঠকে ভষ্মিভূত করে।[১৪০] ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে হিংসা করা জায়েয। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا حَسَدَ إِلَّا فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا 'কেবল দু'টি বিষয়ে হিংসা করা যায়। এক. সেই ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন অতঃপর তা বৈধ পন্থায় অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। দুই. সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন অতঃপর সে তার মাধ্যমে বিচার ফায়ছালা এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।[১৪১]

ক্বিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে শিক্ষার অবস্থা :

ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে দুনিয়াবী শিক্ষা বৃদ্ধি পাবে এবং দ্বীনি শিক্ষা লোপ পাবে। মানুষের মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বিশৃঙ্খলা বেড়ে যাবে। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا ، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا ، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের থেকে ইলম ছিনিয়ে নিবেন না। বরং দ্বীনের আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে নিবেন। তখন কোন আলেম অবশিষ্ঠ থাকবে না। যার দরুন লোকেরা মূর্খদেরকেই নেতা বানিয়ে নিবে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা না জেনে ফৎওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[১৪২] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا 'ক্বিয়ামতের কিছু আলামত হ'ল, ইলম হ্রাস পাবে, অজ্ঞতা প্রসারতা লাভ করবে, মদ পানের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং যেনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করবে।[১৪৩]

সুশিক্ষার সফলতা :

গোটা বিশ্ব আজ অশান্তিতে পুঞ্জিভূত। এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র হাতিয়ার হ'ল সুশিক্ষা। কেননা সুশিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে দুনিয়াতে যেমন মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ও সমাজে শান্তি আসবে, তেমনি আখেরাতের পাথেয় অর্জনের পথ সুগম হবে। মৃত্যুর পর মানুষের আমল বন্ধ হয়ে যায় অথচ দ্বীনি ইলম অর্জন করে শিক্ষা দিলে তা কবরে পৌঁছানোর অন্যতম একটি মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন. إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমল ব্যতীত। এই তিনটি আমল হ'ল, প্রবহমান ছাদাক্বা, এমন ইলম যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন সুসন্তান যে তার জন্য দো'আ করে।[১৪৪]

উপসংহার :

বর্তমান সমাজ প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে কুশিক্ষার দিকে ধাপমান। সন্তান পিতা-মাতাকে, পিতা-মাতা সন্তানকে, ছোট ভাই বড় ভাইকে, এক মুসলিম অপর মুসলিমকে অপমান-অপদস্ত করতে সামান্য পরিমাণ দ্বিধাবোধ করে না। মুসলিমরা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে প্রতিটি জায়গায় নিপীড়নের শিকার। পৃথিবীতে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে। এর প্রকৃত কারণ প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে যাওয়া। তাই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যদি প্রকৃত শিক্ষা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র আলোকে সমন্বয় করা হয় তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে গোটা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাই আসুন! অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের শিক্ষা গ্রহণ করে দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করি এবং আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

[লেখক: দাওরায়ে হাদীছ, ১ম বর্ষ; আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

---

১৩৯. বুখারী, মুসলিম, মিশাকাত হা/৭০১
১৪০. আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫০৪০
১৪১. বুখারী, মুসলিম, মিশাকাত হা/২০২
১৪২. বুখারী, হা/১০০
১৪৩. বুখারী, হা/৮১, ৫২৩১
১৪৪. মুসলিম হা/১৬৩১

তাবলীগ জামায়াত ও বিশ্ব ইজতেমা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

-আকরাম হোসাইন

ভূমিকা :

বর্তমানে মুসলিম সমাজ শিরক বিদ'আতের সর্দিতে ভুগছে। সস্তা ফযীলতের ধোঁকায় পড়ে মুসলিম জাতি আজ দিশেহারা। তারা খুঁজে ফিরছে সত্যের সন্ধানে। কোথায় পাওয়া যাবে সঠিক পথের দিশা, কোথায় পাওয়া যাবে সত্যিকারের আদর্শ? কেননা পৃথিবীর সকল মানুষ কোন না কোন আদর্শের সাথে সংযুক্ত। আওয়ামী লীগের আদর্শ শেখ মুজিবুর রহমান, বি.এন.পি'র আদর্শ জিয়াউর রাহমান, কমিনিস্টদের আদর্শ মাওসেতুং-লেলিন, জামায়াত ইসলামী'র আদর্শ মওদূদী, তাবলীগ জামায়াতের আদর্শ হচ্ছেন মাওলানা ইলিয়াস! মাযার, খানকা ও তরীকা পূজারী মুরীদদের আদর্শ স্ব স্ব পীর-ফকীর। যার যার নেতা-আমীরদের আদর্শ নিয়ে তারা উৎফুল্ল! কোথায় আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শ?

ইসলাম কারো মনগড়া ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থা নয়। এটা বিশ্ব প্রতিপালক মহান আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আর এ দ্বীন প্রচারিত হয়েছিল নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে। এই দ্বীন তথা ইসলামের মূল দর্শন হল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দান। মানব সমাজে আল্লাহর দ্বীনের বার্তা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য কুরআন ও হাদীছে মুসলিম উম্মাহকে বহুবার দির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এমনকি যদি একটি আয়াতও কেউ জানে, তা প্রচার করার জন্য রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন।[১৪৫] সুতরাং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ থেকে কারো পিছিয়ে থাকার কোন সুযোগ নেই। বর্তমানে ফেৎনার যে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে এবং সঠিক দ্বীন প্রচারকের সংখ্যাও যেহেতু খুবই কম, সে কারণে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করা এখন 'ফরযে আইন' হয়ে পড়েছে। সুতরাং কেউ যদি শারঈ ওযর ব্যতীত দৈনন্দিন ব্যস্ততার অজুহাতে বা অলসতাবশতঃ তাবলীগ বা দ্বীনের প্রচার না করে, তাহলে সে নিঃসন্দেহে গোনাহগার হবে।[১৪৬]

তাবলীগের অন্যতম জনপ্রিয় একটা গ্রুপ হল তাবলীগ জামায়াত। এই জামায়াত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে। এমনকি শুনা যায় যে, বিশ্বের যেখানে সত্যিকারের মুসলিমের প্রবেশ নিষেধ সেখানেও এই জামায়াতের অবাধ বিচরণ। এই জামা'আতের দাওয়াতের মূল উৎস হল ফাযায়েলে 'আমাল বা তাবলীগী নিছাব। এই বইটি আমাদের দেশে খুব পরিচিত। দেশের ঘরে ঘরে মসজিদে মসজিদে এই বই পাওয়া যায়। আর তাবলীগী ভাইদের ক্ষেত্রে তো কোন কথায় নাই। তারা এই বই ছাড়া তো কিছুই বুঝে না। এই বইটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, আরবীতে অনুবাদ হয়নি। এমনকি মুসলিমদের তীর্থস্থান সঊদী আরবে এই জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সমস্ত বিশ্বে যেখানে এই জামায়াত ও বইয়ের এত সম্মান, সেখানে কুরআন ও সুন্নাহর দেশে এই জামা'আত ও বই কেন নিষিদ্ধ? তা হয়ত সবারই বোধগোম্য হওয়ার কথা।

১৪৫. বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮।
১৪৬. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪০, সনদ হাসান।

তাবলীগের গুরুত্ব :

তাবলীগ মুসলিম মিল্লাতের অতি পরিচিত একটি শব্দ। যার অর্থ প্রচার ও প্রসার। ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল বিশ্ব মানবতার দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাবার যে গুরু দায়িত্ব মুহাম্মাদ (ছাঃ) কর্তৃক সকল উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর অর্পিত হয়েছে, সেটিকেই তাবলীগ বলে।

মূলতঃ রাসূল (ছাঃ) বিশ্ব মানুষের কাছে দ্বীনের এ দাওয়াত পৌঁছাবার ও প্রচার-প্রসারের মহান দায়িত্ব নিয়েই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। যেমন আগমন করেছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্বে অগণিত নবী ও রাসূল। রাসূল (ছাঃ)-কে তাবলীগ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহ্র বার্তা প্রচার করলেন না *(মায়েদা ৬৭)*।

রাসূল (ছাঃ) হলেন সর্বশেষ নবী। তারপর পৃথিবীতে আর কোন নবী আসবে না। তাই বিদায় হজ্জের সময় রাসূল (ছাঃ) বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা, فليبلغ الشاهد الغائب 'উপস্থিত লোকেরা যেন দ্বীনের এ দাওয়াত অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়'। এর মাধ্যমে সমস্ত উম্মাতে মুহাম্মাদীই তাবলীগ তথা দ্বীন প্রচারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেন, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً 'আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও (মানুষের নিকট) পৌঁছে দাও'।[১৪৭] ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত নির্দেশের বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন যথাযথভাবে। পরবর্তীতে সর্বযুগেই ওলামায়ে উম্মাত হাদীছের সফল বাস্ত বায়নের জন্য জীবন বাজী রেখে সংগ্রাম করেছেন। উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ ছাড়াও অসংখ্য আয়াত ও হাদীছে তাবলীগ তথা দ্বীন প্রচার ও প্রসারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন হিক্বমত বা প্রজ্ঞা দ্বারা এবং সুন্দর উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে উৎকৃষ্টতর পন্ধতিতে বিতর্ক করুন' *(নাহল ১২৫)*। মহান আল্লাহ বলেন, আর যেন তোমদের মধ্যে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম' *(আলে ইমরান ১০৪)*। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা ন্যায়কার্যে আদেশ এবং অন্যায় কার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহতে বিশ্বাস কর' *(আলে ইমরান ১১০)*।

সূরা তাওবার ৭১, ১১২ আয়াতে, সূরা হজ্জেও ৪১ আয়াতে, সূরা লুকমানের ১৭ আয়াতে ও অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র প্রকৃত মুমিন বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট হল, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ। এ দায়িত্বপালনকারী মুমিনকেই সর্বোত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম যে

১৪৭. বুখারী হা/৩২৭৪, তিরমিযী হা/২৬৬৯ ।

আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো মুসলিমদের একজন' *(ফুছ্ছিলাত ৩৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীন হল নছীহত। ছাহাবীগণ বললেন, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য, মুসলিম নেতৃবর্গের জন্য এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য।[১৪৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ নছীহতের জন্য ছাহাবীগণের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেন। মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বায়'আত করেছি ছালাত কায়েম, যাকাত প্রদান ও প্রত্যেক মুসলিমের নছীহত (কল্যাণ কামনা) করার উপর।[১৪৯] এ অর্থে তিনি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের বায়'আত গ্রহণ করতেন।

উক্ত আলোচনায় বুঝা গেল যে, কুরআন ও হাদীছে তাবলীগের গুরুত্ব অপরিসীম। এ থেকে কেউ বিরত থাকতে পারবে না। অতএব মুসলিম মাত্রই দ্বীনে ইসলাম কী? তা জানতে হবে এবং নিজের বাড়িতে তা প্রচার করতে হবে। তারপর তা প্রচার করতে হবে নিজ নিজ গ্রামে, শহরে, প্রয়োজন হলে অন্য দেশেও। তবে প্রচলিত ইলিয়াসী তাবলীগ নয়।

তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতার পরিচিতি :

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একটি রাজ্যের বর্তমান নাম হরিয়ানা এবং সাবেক নাম পাঞ্জাব। ভারতের রাজধানী দিল্লীর দক্ষিণে হরিয়ানার একটি এলাকার নাম মেওয়াত। যার পরিধি দিল্লীর সীমান্ত থেকে রাজস্থান রাজ্যের জয়পুরহাট যেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মেওয়াতে ১৩০৩ হিজরীতে এক হানাফী ব্যক্তির জন্ম হয়। তাঁর নাম ছিল আখতার ইলয়াস। কিন্তু পরে তিনি শুধু ইলয়াস নামে পরিচিত হন। ইনি ১৩২৬ হিজরীতে দেওবন্দ মাদরাসার শাইখুল হাদীছ মাওলানা মাহমুদুল হাসানের কাছে বুখারী ও তিরমিযীর দারস গ্রহণ করেন। এর দু'বছর পরে ১৩২৮ হিজরীতে তিনি সাহারানপুরের মাযা-হিরুল 'উলূমের শিক্ষক হন। ১৩৪৪ হিজরীতে তিনি দ্বিতীয়বারে হজ্জে গমন করেন। এই সময় মদীনায় থাকাকালীন অবস্থায় তিনি (গায়েবী) নির্দেশ পান যে, আমি তোমার দ্বারা কাজ নেব। ফলে ১৩৪৫ হিজরীতে তিনি দেশে ফিরে এসে মেওয়াতের একটি গ্রাম নওহে তাবলীগী কাজ শুরু করেন। পরিশেষে ১৩৬৩ হিজরীর ২১ রজব মোতাবেক ১৩ জুলাই ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।[১৫০]

ইলায়াসী তাবলীগ বনাম রাসূলের তাবলীগ :

(ক) তারা নিজেরা কুরআন বুঝে না অন্যদেরকেও বুঝতে দেয় না। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) নিজে কুরআন শিখিয়েছেন এবং তার প্রচারকও ছিলেন।

(খ) তাদের দাওয়াতী নিয়ম স্বপ্নে প্রাপ্ত।[১৫১] রাসূলের দাওয়াতী নিয়ম স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত *(মায়েদা ৬৭)*।

(গ) তাদের দাওয়াতের মধ্যে সপ্তাহে ১ দিন, মাসে ৩ দিন, বছরে ১ চিল্লা, কমপক্ষে জীবনে ৩ চিল্লা লাগিয়ে দ্বীনি কাজ শিখতে হবে।[১৫২] পক্ষান্তরে রাসূলের দাওয়াতী কাজ এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই।

(ঘ) তাদের দাওয়াতের মধ্যে ইসলামের একটি অপরিহার্য বিধান ও আল্লাহ্‌র প্রিয় জিহাদ নেই। কিন্তু রাসূলের দাওয়াতে জিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

(ঙ) তাদের দাওয়াতে কাফের মুশরিকদের কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) যখন দাওয়াত দিতেন তখন কাফের মুশরিক বাধা দিত।

(চ) তাদের দাওয়াতী কাজ শেখার মূল উৎস হল 'ফাযায়েলে আমাল'। কুরআনের চেয়েও তারা ফাযায়িলে আমাল-এর গুরুত্ব বেশী দেয়। অথচ রাসূলের দাওয়াত শেখার মূল উৎস হচ্ছে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। আর কুরআনের মর্যাদা হচ্ছে সবকিছুর উর্ধ্বে।

(ছ) তারা রাষ্ট্রপ্রধান বা ক্ষমতাশালীদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে না যদিও তারা শিরক করে ও ইসলামের বিরুদ্ধে বলে। রাসূল তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান ও ক্ষমতাশালীদের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন, শিরক ও ইসলাম বিরোধী কাজে বাধা দিয়েছেন।

(জ) তারা কোন দাওয়াতী কাজ করার সময় কুরআন হাদীছের দলীল পেশ করে না, নিজেদের মনগড়া কথা বলে। রাসূল নিজে কোন কিছু বলার বা দাওয়াত দেবার আগে দলীল পেশ করতেন।

(ঝ) তারা কোন মতেই কারো সাথে যুদ্ধ করতে চায় না। রাসূল যুদ্ধ করতে গিয়ে নিজের দাঁতকে শহীদ করেছেন।

(ঞ) তারা শুধু দাওয়াত কিভাবে দিবে তা শেখায় যদিও তা ইসলামী পদ্ধতিতে নয়; অন্য কোন কিছু তারা শিখায় না। রাসূল জীবনের প্রতি মুহূর্তে কি করতে হবে, কার সাথে কিভাবে চলতে হবে সবকিছু শিখিয়েছেন।

(ট) ইলিয়াসী তাবলীগ বুযুর্গদের সন্তুষ্টির জন্য করা হয়।[১৫৩] রাসূলের তাবলীগ একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য *(আন'আম ১৬; বাইয়েনা ৫)*।

(ঠ) ইলিয়াসী তাবলীগের অলিরা গায়েব জানেন।[১৫৪] অথচ রাসূল (ছাঃ) গায়েব জানতেন না *(আন'আম ৫০; 'আরাফ ১৮৮)*।

(ড) ইলিয়াস ছাহেবের আক্বীদায় রাসূল (ছাঃ) জীবিত।[১৫৫] কিন্তু নবী (ছাঃ) ইন্তেকাল করেছেন *(যুমার ৩০)*।

(ঢ) বুযুর্গরা জান্নাত-জাহান্নাম দুনিয়াতে দেখেন।[১৫৬] জান্নাত এমন যে, না কোন চোখ দেখেছে, না কোন কান শুনেছে এবং না কোন হৃদয় কল্পনা করেছে।[১৫৭]

---

১৪৮. মুসলিম হা/২০৫।

১৪৯. বুখারী হা/৫৭।

১৫০. মাওলানা আবুল হাসান 'আলী রচিত মাওলানা ইলয়াস রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি আওর উনকি দ্বীনী দা'ওয়াত- ৪৮, ৫৭, ৬১, ১৯৩ পৃষ্ঠা এবং রববানী বুক ডিপো প্রকাশিত তাবলীগী নিসাব-এর ভূমিকা পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

১৫১. মালফূযাতে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস, পৃঃ ৫১ ।

১৫২. মালফূযাতে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস, পৃঃ ৫১ ।

১৫৩. ফাযায়েলে আমাল, ভূমিকা, ১ম পৃষ্ঠা।

১৫৪. যাকারিয়া সাহারানপুরী, অনুবাদ : মোহাম্মাদ সাখাওাত উল্লাহ, ফাযায়েলে ছাদাকাত, (তাবলিগী কুতুবখানা ১৪২৬ হিজরী) ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা : ২৭।

১৫৫. ফাযায়েলে হাজ্জ, পৃঃ ১৩০-১৩১।

(ণ) ইলিয়াসী তাবলীগে বুযুর্গদের মৃত্যুকে অস্বীকার করা হয়েছে।[১৫৮] রাসূল (ছাঃ)-এর তাবলীগের প্রত্যেকের মৃত্যু সত্য *(আল-ইমরান ১৮৫)*।

(ত) পর্যবেক্ষক ফেরেশতারা আল্লাহ ও বান্দার গোপন যিকির সম্পর্কে জানতে পারে না।[১৫৯] ফেরেশতাগণ পর্যবেক্ষণ হিসাবে রয়েছেন এবং আমরা যা করি তারা সে সব জানেন *(ইনফিতার ১০ ও ১২)*।

(থ) ইলিয়াসী তাবলীগের কেন্দ্রস্থল ভরতের নিযামুদ্দীন মসজিদের ভিতরে মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব ও তার পুত্রের কবর রয়েছে।[১৬০] নবী (ছাঃ) কবরের দিকে ছালাত পড়তে ও কবরকে পাকা নিষেধ করেছেন।[১৬১]

(দ) মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ছাহেবের ইন্তিকালের পর আল্লাহ্‌র সাথে মিশে গেছেন।[১৬২] নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র সমতুল্য কেউ নেই, তার সাথে কেউ মিশতে পারে না *(ইখলাস ৪; শূরা ১১)*।

বিশ্ব বরেণ্য আলেমদের দৃষ্টিতে তাবলীগ জামাত ও গ্রন্থসমূহ :

১. সঊদী আরবের প্রধান মুফতী ও ইসলামী গবেষণা ও ফাতাওয়া অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক এবং সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের প্রধান শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, তাবলীগপন্থীদের নিকট আক্বীদা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই এবং তাদের নিকট রয়েছে কিছু কুসংস্কার, বিদ'আত ও শিরকী কার্যক্রম। সুতরাং তাদের সাথে বের হওয়া জায়েয নয়। তাদের নিকট ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে। তাদের আরো অধিক ইসলামী শরী'আহ্‌র সঠিক জ্ঞানের প্রয়োজন এবং কুরআন ও হাদীছ সম্পর্কে বিজ্ঞ আলেমের প্রয়োজন, যাতে তারা তাদেরকে তাওহীদ ও সুন্নাহ্‌র জ্ঞানে আলোকিত করবেন।[১৬৩]

২. সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের সদস্য এবং জাতীয় ফাতাওয়া বোর্ডের স্থায়ী সদস্য মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, ইলিয়াসী তাবলীগ জামায়াত পন্থীদের অনুরোধ করছি, তারা যেন তা পরিত্যাগ করেন এবং রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত আমল অনুযায়ী আমল করেন। এটাই তাদের জন্য উত্তম এবং প্রতিফলও ভাল হবে এবং তাদের মধ্যে যারা তাদের বানানো ছয় উছূলকে নিজের চলার জন্য মূলভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে, তারা যেন এই চিন্তাধারা পরিবর্তন করে ছহীহ হাদীছের দিকে যেন ফিরে যায়। তারা যা করছে তা শরী'আত সম্মত নয়। তাদের সহ কোন মানুষের জন্য এটা জায়েয হবে না যে, সে ইসলামের যে কোন গল্প বলুক বা ওয়ায করুক এবং তাতে এমন হাদীছের কথা উল্লেখ করে যা সে জানে না। সেটি ছহীহ, যঈফ না মওযূ। কারো জন্য দুর্বল বা যঈফ হাদীছ বর্ণনা করা জায়েয নয়। আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাদেরকে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথ দেখান- আমিন।[১৬৪]

৩. সঊদী আরবের সাবেক সকল মুফতীদের প্রধান ও ইসলামী গবেষণা ও ফাতাওয়া অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক এবং সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের প্রধান শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম (রহঃ) তাবলীগ জামায়াত সম্পর্কে বলেন, 'এই জামায়াতের কোন ফায়েদা নেই। এটি একটি বিদ'আতী এবং গোমরাহ সংগঠন। তাদের তাবলীগী নিছাব পড়ে দেখলাম তা গোমরাহী ও বিদ'আতে ভরপুর। এতে কবর পূজা এবং শিরকের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। বিষয়টি এমনই যে, এ ব্যাপারে চুপ থাকা যায় না।[১৬৫]

৪. বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও মুহাক্কিক এবং বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদ শায়খ আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, তাবলীগ জামা'আত আল্লাহ্‌র কুরআন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং সালফে সালেহীনদের পন্থার উপর নয়। (ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈনদের একত্রে সালফে সালেহীন বলা হয়)। এই তাবলীগ জামা'আতের সাথে বের হওয়া জায়েয নয়। তাদের উচিত আগে ইসলামের সঠিক জ্ঞান শিক্ষা নেয়া। তারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে তাদের মূলনীতি হিসাবে গণ্য করে না (যার বাস্তব প্রমাণ তাদের ফাযায়িলে আমাল সহ অন্যান্য গ্রন্থসমূহ)। যদিও তারা মুখে বলে যে, তাদের দাওয়াত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক কিন্তু এটা নিছক তাদের মুখের কথা; তাদের সঠিক আক্বীদা নেই, তাদের বিশ্বাস জট পাকানো। এদের স্বচ্ছ জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এই তাবলীগ জামায়াত মূলতঃ ছূফী মতবাদের ধারক ও বাহক।[১৬৬]

৫. সঊদী আরবের সর্বচ্চ ওলামা পরষিদের সদস্য আব্দুর রাযযাক আফিফী বলেন, বাস্তবে তাবলীগপন্থিরা বিদ'আতী, ইসলাম বিকৃতকারী এবং কাদেরীয়া সহ অন্যান্য বাতিল তরীকার অনুসারী। তারা আল্লাহ্‌র পথে বের হয়নি বরং তাদের প্রতিষ্ঠাতা আমীর ইলিয়াসের মনগড়া পথে বের হয়েছে; তারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ডাকে না বরং তারা অতি সূক্ষ্মভাবে ইলিয়াসের দিকে ডাকে। আমি অনেক দিন আগে থেকেই এদের চিনি। এরা মিসর, ইসরাঈলে বা আমেরিকায় যে স্থানেই থাকুক না কেন, এরা বিদ'আতী।[১৬৭]

৬. সঊদী অরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের সদস্য শাইখ সালেহ বিন ফাওযান (রহঃ) বলেন, দাওয়াতের নাম ব্যবহার করে তাবলীগ জামায়াতের লোকেরা যা করে তা বিদ'আত;

১৫৬. শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ); অনুবাদ : মুফতী মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ, ফাযায়েলে যিকির, (দারুল কিতাব : বাংলাবাজার, ঢাকা; অক্টোবর, ২০০১ ইং), পৃঃ ১৩৫।
১৫৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬১২।
১৫৮. ফাযায়েলে ছাদাকাত ২/২৭।
১৫৯. ফাযায়েলে যিকির, পৃঃ ৭০।
১৬০. আকফাতুন মাঅ জামায়াতিত তাবলীগ, পৃঃ ৫৭।
১৬১. মুসলিম, মিশকাত-১৪২।
১৬২. মালফূযাতে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস, শেষ পৃষ্ঠা।
১৬৩. তারিখঃ ৬/১২/১৪১৬ হিজরী, মক্কা, ফাতাওয়া ও চিঠিপত্র বিভাগ, গ্রান্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায, সঊদী আরব।

১৬৪. শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল উছায়মীন (র:) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ফতওয়া, ফাতাওয়া ও চিঠিপত্র বিভাগ, সঊদী আরব।
১৬৫. তারিখ: ১৯/১/১৩৮২ হিজরী, ফতওয়া ও চিঠিপত্র, গ্র্যান্ড মুফতী শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬৭-২৬৮, স্মারক নং ৩৭/৮/৫ ডি. ২১/১/১৩৮২ সঊদী আরব।
১৬৬. ইমারতী ফাতাওয়া, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী, পৃষ্ঠা-৩৮।
১৬৭. ফাতাওয়া ও চিঠিপত্র বিভাগ, শাইখ আব্দুর রাযযাক আফিফী ফাতাওয়া, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৪, সঊদী আরব।

ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈ অর্থাৎ সালফে সালেহীনরা এভাবে দাওয়াত দেননি। এদের মাঝে অনেক বিদ'আত এবং ভ্রান্ত কুসংস্কার রয়েছে। এদের কর্মনীতি রাসূল (ছাঃ)-এর কর্মসূচী ও কর্মনীতির পরিপন্থী ও বিরোধী। এটি একটি বিদ'আতী ছূফী জামায়াত, এদের সম্পর্কে সাবধান থাকা অপরিহর্য। তারা বিদ'আতী চিল্লা দেয়। তাদের দ্বারা ইসলামের কোন ফায়দা হবে না এবং কোন মুসলিমের জায়েয হবে না এ জামায়াতের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং এদের সাথে চলা।[১৬৮]

তাবলীগী নিছাব পরিচিতি :

ইলিয়াসী তাবলীগের প্রতি সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর যেলার কান্ধেলাহ নিবাসী ও মাযাহিরুল 'উলূম সাহারানপুরের সাবেক শাইখুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়াহ্ হানাফী নয়টি বই লেখেন উর্দূ ভাষায়। তার নামগুলো হলো : ১. হেকায়াতে ছাহাবা; ২. ফাযায়েলে নামায; ৩. ফাযায়েলে তাবলীগ; ৪.ফাযায়েলে রামাযান ৫. ফাযায়েলে যিকির; ৬. ফাযায়েলে কুরআন; ৭. ফাযায়েলে দরুদ; ৮. ফাযায়েলে হাজ্জ; ৯. ফাযায়েলে ছাদাক্বাহ।

তাবলীগ জামায়াত কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ে শিরক-বিদ'আতের নমুনা :

'ফাযায়লে আমাল' নামক বইটিতে অধিকংশ আলোচনাই শিরক-বিদআত, মিথ্যা কিচ্ছা-কাহিনী, কুসংস্কার, সূত্রহীন, বানোয়াট জাল ও যঈফ হাদীছে পরিপূর্ণ। যেমন,

(এক) তাবলীগ জামা'য়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর নির্দেশে মাওলানা যাকারিয়াহ্ ফাযায়েলে তাবলীগ বইটি লেখেন। ঐ বইয়ের ভূমিকায় তিনি বলেন, ইসলামী মুজাদ্দিদের এক উজ্জ্বল রত্ন এবং উলামা ও মাশায়েখদের এক চাকচিক্যময় মুক্তার নির্দেশ যে, তাবলীগে দ্বীনের প্রয়োজন সংক্ষিপ্তভাবে কতিপয় আয়াত ও হাদীস লিখে পেশ করি। আমার মত গুনাহগারের জন্য এরূপ ব্যক্তিদের সন্তুষ্টিই নাজাতের ওয়াসিলা বইটি পেশ করলাম।[১৬৯] অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন, আপনি বলুন! আমার ছালাত, আমার কুরবাণী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য *(আন'আম ১৬২)*। এবার বুঝুন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে মাওলানা যাকারিয়াহ্ ইলিয়াস ছাহেবের সন্তুষ্টির অর্জন করতে চাইছে।

(দুই) ক্ষুধার্ত এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবরের পার্শ্বে গিয়ে খাদ্যের আবেদন করে ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই অবস্থায় তার নিকট রুটি আসল, ঘুমন্ত অবস্থায় অর্ধেক রুটি খাওয়ার পর জাগ্রত হয়ে অবশিষ্ট রুটি খেলেন।[১৭০]

(তিন) জনৈকা মহিলা ৩ জন খাদেম কর্তৃক মার খাওয়ার পর রাসূলের কবরের পার্শ্বে গিয়ে বিচার প্রার্থনা করলে, আওয়াজ আসল ধৈর্য ধর, ফল পাবে। এর পরেই অত্যাচারী খাদেমগণ মারা গেল।[১৭১]

(চার) অর্থাভবে বিপন্ন ব্যক্তি রাসূলের কবরের পার্শ্বে হাযির হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করায় তা মঞ্জুর হল। লোকটি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখতে পেল যে, তার হাতে অনেকগুলো দিরহাম।[১৭২]

(পাঁচ) মদীনায় মসজিদে আযান দেওয়া অবস্থায় এক খাদেম মুয়াযিযনকে প্রহার করায় রাসূলের কবরে মুয়াযিযন কর্তৃক বিচার প্রার্থনা। প্রর্থনার ৩ দিন পরেই ঐ খাদেমের মৃত্যু হয়।[১৭৩]

(ছয়) জনৈক অসুস্থ ব্যক্তি চিকিৎসায় ব্যর্থ হওয়ায় ঐ ব্যক্তির আত্মীয়, 'করডোভার এক মন্ত্রী 'আরোগ্যের আরয করে রাসূলের কবরে পাঠ করার জন্য অসুস্থ ব্যক্তিকে পত্রসহ মদীনায় প্রেরণ। কবরের পার্শ্বে পত্র পাঠ করার পরেই রোগীর আরোগ্য লাভ।[১৭৪]

(সাত) কোন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর রওযায় আরয করায় রওযা হতে হস্ত মুবারক বের হয়ে আসলে উহা চুম্বন করে সে ধন্য হল। নব্বই হাযার লোক তা দেখতে পেল। মাহবুবে সোবহানী আব্দুল কাদের জিলানীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।[১৭৫]

(আট) হে আল্লাহ্র পেয়ারা নবী (ছাঃ)! মেহেরবানী পূর্বক আপনি একটু দয়া ও রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।[১৭৬]

(নয়) আপনি সারা বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ, কাজেই আমাদের মত দুর্ভাগা হতে আপনি কী করে গাফেল থাকতে পারেন।[১৭৭]

(দশ) আপনি সৌন্দর্য ও সৌরভের সারা জাহানকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলুন এবং ঘুমন্ত নারগিছ ফুলের মত জাগ্রত হইয়া সারা বিশ্ববসীকে উদ্ভাসিত করুন।

(এগার) আমাদের চিন্তাযুক্ত রাত্রিসমূহকে আপনি দিন বানাইয়া দিন এবং আপনার বিশ্বসুন্দর চেহারার ঝলকে আমাদের দ্বীনকে কামিয়াব করিয়া দিবেন।[১৭৮]

(বার) দুর্বল ও অসহায়দের সাহায্য করুন আর খাঁটি প্রেমিকদের অন্তরে সান্ত্বনা দান করুন।[১৭৯]

(তের) আমি আপন অহংকারী নাফছে আম্মারার ধোকায় ভীষণ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। এমন অসহায় দুর্বলদের প্রতি করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।[১৮০]

(চৌদ্দ) যদি আপনার করুণার দৃষ্টি আমার সাহায্যকারী না হয় তবে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেকার ও অবশ হইয়া পড়িবে।[১৮১]

(পনের) কয়েকজন যুবক নামায পড়তে পড়তে কঠোর সাধনা করে ইহলোক ত্যাগ করে আল্লাহর দরবারে চলে যাওয়ার গল্প।[১৮২]

(ষোল) কোন বুজুর্গের এশার অযু দ্বারা একাধারে ৪০ বছর পর্যন্ত ফজর নামাজ পড়ার কল্প-কাহিনী।[১৮৩]

---

১৬৮. তারিখঃ ১৩/৫/১৪১৭ হিজরী, ফাতাওয়া ও চিঠিপত্র, শাইখ সালহ বিন ফাওযান (রহঃ), সঊদী আরব এবং দাওয়াত ও ইলমের ব্যাপারে তিনটি বক্তব্য-শায়েখ ফাওযান।

১৬৯. ফাযায়েলে আমাল- ভূমিকায় ১ম পৃষ্ঠা।

১৭০. ফাযায়েলে হজ্জ, পৃঃ ১৫৫-১৫৬।

১৭১. ফাযায়েলে হজ্জ, পৃঃ ১৫৯।

১৭২. ফাযায়েলে হজ্জ, পৃঃ ১৬২-১৬৩।

১৭৩. ফাযায়েলে হজ্জ, পৃঃ ১৬২-১৬৩।

১৭৪. ফাযায়েলে হজ্জ, পৃঃ ১৬৭।

১৭৫. ফাযায়েলে হজ্জ, পৃঃ ১৫৯।

১৭৬. ফাযায়েলে দরুদ, পৃঃ ১৪২।

১৭৭. ফাযায়েলে দরুদ, পৃঃ ১৪২।

১৭৮. ফাযায়েলে দরুদ, পৃঃ ১৪৩।

১৭৯. ফাযায়েলে দরুদ, পৃঃ ১৪৩।

১৮০. ফযায়িলে দরুদ, পৃঃ ১৪৪।

১৮১. ফযায়িলে দরুদ, পৃঃ ১৪৪।

১৮২. ফাযায়েলে নামায, পৃঃ ৩৪-৩৫।

১৮৩. ফাযায়েলে নামায, পৃঃ ৯৪, ১০২।

(সতের) জনৈক ব্যক্তি একই অজু দ্বারা ১২ দিন নামায পড়েছেন।[১৮৪]

(আঠার) আদম (আঃ) দুনিয়াতে এসে ৪০ বছর যাবৎ ক্রন্দন করেও ক্ষমা পাননি, সর্বশেষে জান্নাতে খোদিত মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর নামের অসীলায় দো'আ করে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েছেন।[১৮৫]

(উনিশ) হে মুহাম্মাদ (ছাঃ) আপনাকে সৃষ্টি না করলে বিশ্বজাহানের কিছুই সৃষ্টি করতাম না।[১৮৬] এটি লোক মুখে হাদীছে কুদসী হিসাবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধ। অথচ হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এটি একটি ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত, মিথ্যুকদের বানানো কথা। রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের সাথে এর সামান্যতম মিল নেই। ইমাম ছাগানি, আল্লামা পাটনী, মোল্লা আলী কারী, শায়খ আজলুনী, আল্লামা কাউকজী, ইমাম শওকানী, মুহাদ্দিস 'আব্দুল্লাহ ইবনু সিদ্দিক আল-গুমারী এবং শাহ 'আব্দুল 'আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কিরাম এটিকে জাল বলেছেন।

(বিশ) রাসূল (ছাঃ) এর মলমূত্র পাক-পবিত্র ছিল ও রক্ত হালাল ছিল এবং সাহাবায়ে কেরামদের দুইজন তা খেয়ে জান্নাতের নিশ্চয়তা পেয়েছেন স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) থেকে।[১৮৭] অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন, আপনি বলে দিন, যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাইনা কোন ভক্ষণকারীর জন্যে, যা সে ভক্ষণ করে; কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের মাংস এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ; যবেহ করা জন্তু যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। অতঃপর যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে এমতবস্থায় যে অবাধ্যতা করে না এবং সীমালঙ্ঘন করে না, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল দয়ালু *(আন'আম ৬/১৪৫)*।

বিশ্ব ইজতেমা প্রসঙ্গ :

'ইজতেমা' শব্দের অর্থ সমাবেত করা, সভা-সমাবেশ বা সম্মেলন। ধর্মীয় কোন কাজের জন্য বহুসংখ্যক মানুষকে একত্র করা, কাজের গুরুত্ব বোঝানো, কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া এবং ব্যাপকভাবে এর প্রচার-প্রসারের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইত্যাদি বিষয়কে ইসলামের পরিভাষায় ইজতেমা বলা হয়। তাবলীগ জামা'আতের বড় সম্মেলন হচ্ছে 'বিশ্ব ইজতেমা'। ১৯৪৪ সালে প্রথম বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার কাকরাইল মসজিদে। ১৯৪৮ সালে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের হাজি ক্যাম্পে এবং ১৯৫০ সালে নারায়ণগঞ্জের সিদ্দিরগঞ্জে। ১৯৬৫ সালে টঙ্গীর পাগার নামক স্থানে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছিল খুব ছোট পরিসরে। এরই মধ্যে তাবলীগের কার্যক্রম বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে, শহর-বন্দরে, ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ইজতেমায় দেশি-বিদেশী বহু মানুষের উপস্থিতি বেড়ে যায়। ১৯৬৭ সালে টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমার স্থান নির্ধারণ করা হয়। তখন থেকেই বিশ্ব ইজতেমা সর্ববৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশের পরিণত হয়! ১৯৭২ সালে সরকার টঙ্গীর ইজতেমাস্থলের জন্য সরকারী জমি প্রদান করেন এবং তখন থেকে বিশ্ব ইজতেমার পরিধি আরো বড় হয়ে উঠে। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন সরকার এ জায়গায় ১৬০ একর জমি স্থায়ীভাবে ইজতেমার জন্য বরাদ্দ দেয় এবং অবকাঠামোগত কিছু উন্নয়ন ঘটায়।

উক্ত ইজতেমার বিশেষ আকর্ষণ হল এই আখেরী মুনাজাত! মানুষ এখন ফরয ছালাত আদায়ের চাইতে আখেরী মুনাজাতে যোগদান করাকেই অধিক গুরুত্ব দেয়। আখেরী মুনাজাতে শরীক হবার জন্য নামাজী, বে-নামাজী, ঘুষখোর, সন্ত্রাসী, বিদ'আতী, দুস্কৃতিকারী দলে দলে ময়দানের দিকে ধাবিত হয়। কেউ ট্রেনের ছাদে, কেউ বাসের হ্যান্ডেল ধরে, নৌকা, পিকআপ প্রভৃতির মাধ্যমে ইজতেমায় যোগদান করে। তারা মনে করে সকল প্রাপ্তির সেই ময়দান বুঝি টঙ্গির তুরাগ নদীর পাড়ে। মানুষ পায়খানা-পেসাব পরিষ্কার করেও সেখানে ছওয়াবের আশায় থাকেন। এ যেন ঝওয়াবের ছড়া ছড়ি, যে যতো কুড়ায়ে থলে ভরতে পারবে তার ততোই লাভ। ট্রেনের ছাদের উপর মানুষের ঢল দেখে টিভিতে সাংবাদিক ভাইবোনগণ মাথায় কাপড় দিয়ে বার বার বলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ আজ তাদের পাপের প্রাশ্চিত্ত করতে ছুটে চলছেন তুরাগের পাড়ে! পরের দিন বড় হেডিং দেখে যারা এবার যেতে পারেননি তারা মনে মনে ওয়াদা করে বসবেন যে আগামীতে যেতেই হবে। তা না হলে পাপীদের তালিকায় নাম থেকেই যাবে! এভাবে পঙ্গোপালের মতো এদের বাহিনী বড়তে থাকবে। এদের আর রুখা যাবে না। কেননা স্বয়ং রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবনে, প্রধানমন্ত্রী গণভবনে, বিরোধীদলিয় নেত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীগণও সেখানে গিয়ে আঁচল পেতে প্রার্থনা করেন। টিভিতে সরাসরি মুনাজাত সম্প্রচার করা হয়। রেডিও শুনে রাস্তার ট্রাফিকগণও হাত তুলে আমিন! আমিন! বলতে থাকে। কি সর্বনাশা বিদ'আত আমাদের কুরে কুরে গ্রাস করছে তা আমরাও জানি না!

আরাফার মাঠে হজ্জ এর সময় লক্ষ লক্ষ লোক সমাগম হয়। সেখানে কেন সম্মিলিত মুনাজাত হয় না? যেখানে আল্লাহ নিজে হাযির হতে বলেছেন, যেখানে তিনি অগণিত মানুষকে ক্ষমা করে দেন। এই প্রশ্নের জবাব যারা বুঝতে চেষ্টা করেছে তারাই বুঝতে পারবে কেন বিশ্ব ইজতেমা বিদ'আত? সম্মিলিত মুনাজাত এর কারণেই বিশ্ব ইজতেমা বিদ'আত। যদি আখেরী মুনাজাত না হত তবে অন্তত বলা যেত ইসলামিক আলোচনার জন্য বিশ্ব ইজতেমা। তাছাড়া এই ইজতেমা বিদ'আতী কিতাব থেকে বয়ান করা হয়।

অনেকে আবার এই ইজতেমাকে ২য় হজ্জ বলে উল্লেখ করেন! (নাঊযুবিল্লাহ)। এমনকি 'চ্যানেল আই' গণমাধ্যমেও এটিকে হজ্জের সাথে তুলনা করেছে! আল্লাহ তা'আলা কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোথাও ২য় হজ্জ করতে বলেন নি। এমন কাজ সওয়াবের আশায় করলে আল্লাহর দেয়া নির্ধারিত বিধানের সীমালঙ্ঘন করা হবে। আর আল্লাহর দেয়া সীমালঙ্ঘন করলে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে ঢুকাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি *(নিসা ১৪)*।

ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান ও প্রচার করার লক্ষ্যে যেকোন মাহফিল বা ইজতেমার আয়োজন করা ও সেখানে যোগদান করা যায়। কিন্তু যদি ইসলামের নামে জাল, যঈফ ও বানোয়াট হাদীছের এবং ভিত্তিহীন ফাযায়েল ও কেচ্ছা-কাহিনী শোনার দাওয়াত দেয়া হয়, বিদ'আতী আক্বীদা ও আমল প্রচার করা হয়,

১৮৪. ফাযায়েলে নামায, পৃঃ ৯৮।
১৮৫. ফাযায়েলে যিকির, পৃঃ ১৫৩-১৫৪।
১৮৬. ফাযায়েলে যিকির, পৃঃ ১৫৩।
১৮৭. হেকায়াতে সাহাবা, পৃঃ ২৬২-২৬৩।

তাহলে সেখানে যোগদান করা যাবেনা। চাই সেটা বিশ্ব ইজতেম হোক বা অন্য কোন ইজতেমা হোক। কারণ বিদ‘আতীদের সঙ্গ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। বিদ‘আতী লোকেরা ক্বিয়ামতের দিন হাউয কাওছারের পানি পান করতে পারবে না।[১৮৮]

বিদ‘আতের তিনটি মৌলিক নীতিমালা :

১.এমন আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট ছওয়াবের আশা করা, যা শরী‘আত সিদ্ধ নয়। কেননা শরী‘আতের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হল এমন আমল দ্বারা আল্লাহর নিকট ছওয়াবের আশা করতে হবে যা কুরআনে আল্লাহ নিজে কিংবা ছহীহ হাদীছে তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) অনুমোদন করেছেন। তাহলেই কাজটি ইবাদত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যে আমল অনুমোদন করেননি সে আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা হবে বিদ‘আত।

২. দ্বীনের অনুমোদিত ব্যবস্থা ও পদ্ধতির বাইরে অন্য ব্যবস্থার অনুসরণ ও স্বীকৃতি প্রদান। ইসলামে একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, শরীয়তের বেঁধে দেয়া পদ্ধতি ও বিধাণের মধ্যে থাকা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি ইসলামী শরিয়ত ব্যতিত অন্য বিধান ও পদ্ধতি অনুসরণ করল ও তার প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করল সে বিদ’আতে লিপ্ত হল।

৩. যে সকল কর্মকান্ড সরাসরী বিদ’আত না হলেও বিদ’আতের দিকে পরিচালিত করে এবং পরিশেষে মানুষকে বিদ’আতে লিপ্ত করে, সেগুলোর হুকুম বিদ’আতেরই অনুরূপ।

সুতরাং যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের ছহীহ হাদীছকে জেনে বুঝে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে পরিত্যাগ করে কারো কল্পিত রায় ক্বিয়াসের অনুসরণ করে তারা আল্লাহর রাসুলের অবাধ্য।

বিদ’আতী কাজের পরিণতি :

১. ঐ বিদ‘আতী কাজ আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হবে না।

২. বিদ‘আতী কাজের ফলে মুসলিম সমাজে গোমরাহীর ব্যাপকতা লাভ করে।

৩. আর এই গোমরাহীর ফলে বিদ‘আতীকে জাহান্নাম ভোগ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের শরী‘আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।[১৮৯]

তাবলীগ জামায়াতের প্রতি আমাদের আহ্বান :

যদি আপনারা প্রকৃত তাবলীগ করতে চান তাহলে টঙ্গী থেকে ঘোষণা দিন

(ক) আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রতি আমল করি।

(খ) মূর্তিপুজা হারাম, যে লোক নিজে ছালাত পড়ে ও মূর্তিপুজাকে নীরব সমর্থন করে সে প্রকারান্তে মূর্তিপুজা করে।

(গ) ফাযায়েলে আমাল নয়, আল-কুরআনই মুসলিমদের একমাত্র সংবিধান।

(ঘ) মুরুব্বী, হুজুর, আকাবীর, বুযুর্গদের স্বপ্ন ও বিদ‘আতী আমল আর নয়, আজ থেকে সুন্নাতের অনুসারী হোন।

(ঙ) পান, জর্দা, তামাক, গুল সহ সকল নেশাদার দ্রব্য হারাম।
(চ) নির্ভয়ে বলুন! মাযারে পুস্পস্তবক অর্পণ করা, জীবিত ও মৃত মানুষদের সম্মানে দাঁড়ানো, শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ সহ যাবতীয় শিরকী কর্মকান্ড বন্ধ করুন।

(ছ) সকল ধর্মের লোকের বাৎসরিক মুনাজাতে অংশ নেওয়ার আগে কালেমা পড়ে মুসলিম হতে হবে। অন্যথায় এ ধরনের ইজতেমাকে ইসলামী বলা যায় কিভাবে? যদিও ফরয ছালাতের পর সম্মিলিত হাত তুলে দু‘আ করা বিদ‘আত।

হিন্দুরা গঙ্গায় স্নান করে। একটা মন্ত্র পড়ে সকল পাপ মোচন করে ফিরে আসে। আর ইলিয়াসী জামায়াতের ভাইয়েরা টঙ্গী ইজতেমায় গিয়ে একখানা আখেরী মুনাজাত দিয়ে গুনাহ মোচন করে ফিরে আসে! অতএব আসুন, ফাযায়েলে আমলকে তুরাগ নদীতে বিসর্জন দিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদিছ ভিত্তিক আমল করার চেষ্টা করি।

উপসংহার :

মুসলিম সমাজে ক্রমশঃ আল্লাহ প্রদত্ত পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতে নববীর নির্ধারিত দ্বীনের পরিবর্তে কিছু মনগড়া নবাবিস্কৃত আদর্শ ও নীতি অনুপ্রবেশ করছে। ফলশ্রুতিতে আমরা প্রকৃত ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে তাওহীদ ও সুন্নাহ্‌র পরিবর্তে শিরক বিদ‘আতের প্রাদুর্ভাব ঘটছে। তাবলীগপন্থীদের টুপি, পাগরী, লম্বা পোশাকের বাহ্যিক রূপ দেখে অনেকে মনে করেন এরাই সঠিক পথে আছে। বহু মসজিদে তাদেরকে দেখতে পাবেন, ‘বাকি নামাজ বাদ ঈমান ও আমলের কথা হবে আমরা সবাই বসি বহুত ফায়দা হবে’।

আসলে প্রকৃতপক্ষেই ঐসব শিরক-বিদ‘আতীদের মজলিসে আপনি বসলে ঈমান ও আমলে ফায়দা তো দূরের কথা বরং ঈমান ও আমল দু’টিই হারাবেন। কারণ আক্বীদা শুদ্ধ না হলে আমল বেকার হয়ে যাবে। একথা অনস্বীকার্য যে, ইলিয়াসী তাবলীগের সাহচর্যে বেশ কিছুলোক ছালাত-ছিয়াম ধরেছেন। কিন্তু সেই সাথে তারা মাকাল ফলরূপী জাল ও যঈফ হাদীছের ঘূর্ণিপাকে ঘুরপাকও খাচ্ছেন এবং বহু কাল্পনিক ঘটনার ঘোরে মজে রয়েছেন। এমতাবস্থায় তাদের সামনে বাহ্যিক আকর্ষণহীন ছহীহ হাদীছে পেশ করলে তারা মাকাল ফলের মত আকৃষ্ট হন না এবং সত্য ঘটনা শুনে মজা পান না। তাই তারা জাল-হাদীছ ও মিথ্যা তথ্য পেশকারীদেরকে পরম হিতাকাঙ্খী মনে করে। আর ছহীহ তথ্য পেশকারীদেরকে চরম শত্রু ভাবছেন এবং কিছু ইলিয়াসী তাবলিগী মুবাল্লিগ তাদেরকে নাচাচ্ছেন। ফলে কোন কোন জায়গায় ছহীহ ও জাল হাদীছ ওয়ালাদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিচ্ছে।

‘ফাযায়েলে আমাল’ বইটিতে কুরআন ও হাদীছের পরিপন্থী অনেক কথা আছে। আবার পবিত্র কুরআনের কিছু সঠিক ব্যাখ্যাও আছে। যঈফ ও জাল হাদীছের সাথে কিছু সঠিক হাদীছও আছে। সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রিত কিতাব তাবলীগী নিছাব তথা ফাযায়েলে আমাল পাঠাভ্যাস ও শ্রবণ বর্জন করা উচিত। কারণ মদ ও জুয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ঐ দু’টির মধ্যে বড় পাপ আছে এবং লোকদের জন্য লাভও আছে। তবে ওদের পাপটা ওদের লাভের চেয়ে বেশী বড়’ *(বাক্বারাহ ২/)*। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা যাদের রব, মুহাম্মাদ (ছাঃ) যাদের আদর্শ, কুরআন যাদের সংবিধান, তাওহীদ, রেসালাত এবং আখেরাত যাদের ঈমানের মূল বিষয়, তাক্বওয়া ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি যাদের কাম্য তাদের নিকট ঐ ভুল কিতাবটি অবশ্যই পরিহার করা উচিত। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন!

[লেখক- তৃতীয় বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ ও দফতর সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

১৮৮. মুসলিম, হা/৪২৪৩।
১৮৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০।

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আধুনিক যুগ : ২য় পর্যায় (ক)

دور الجديد : المرحلة الثانية (الف)

জিহাদ আন্দোলন ১ম পর্যায় শহীদায়েন (রহঃ)

حركة الجهاد للشهيدين

(১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১) ৫২ বৎসর

শাহ ইসমাঈল (রহঃ) ও জিহাদ আন্দোলন

পাঞ্জাবে মুসলমানদের উপর শিখদের অবিরত লোমহর্ষক নির্যাতনের খবর শুনে ও দীর্ঘ দু'বছর যাবত পাঞ্জাবের গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে অভিজ্ঞতা হাছিলের পর দিল্লী ফিরে এসে শাহ ইসমাঈল গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।[১৯০] অবশেষে সশস্ত্র প্রতিরোধই এর একমাত্র পথ হিসাবে তিনি সাব্যস্ত করেন ও সেমতে মানসিক প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ইতিমধ্যে দেশ হ'তে ইংরেজ শাসন উৎখাতের উদ্দেশ্য নিয়ে সুদক্ষ সৈনিক সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভীর (১২০১-১২৪৬ হিঃ/১৭৮৬-১৮৩১ খ্রিঃ) দ্বিতীয়বার (১২৩১/১৮৬১ খৃঃ) দিল্লী আগমনের খবর শুনে তিনি যেন পথ খুঁজে পেলেন এবং বুযর্গ উস্তাদ ও চাচা শাহ আবদুল আযীযের ইশারায় তিনি ও মাওলানা আবদুল হাই (মৃঃ ১২৪৩/১৮২৮ খৃঃ) সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর হাতে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁদের বায়'আতের সাথে সাথে অলিউল্লাহ-পরিবারের সকলে 'আমীরে জিহাদ' হিসাবে তাঁর হাতে বায়'আত নেন। শুরু হ'ল জিহাদের পরিকল্পনা ও ব্যাপক প্রস্তুতি। সৈয়দ আহমাদ যুদ্ধের ময়দানের 'আমীর' হলেও আল্লামা ইসমাঈল ছিলেন প্রধান সেনাপতি ও সকল বিষয়ের মূল পরিকল্পক। তিনিই ছিলেন জিহাদের প্রাণপুরুষ। তাঁদের পরিচালিত 'দাওয়াত ও জিহাদ'-কে আমরা অভিন্ন লক্ষ্যে নিয়োজিত চারটি স্তরে ভাগ করতে পারি।[১৯১] যেমন- ১. সৈয়দ আহমাদের হাতে 'বায়'আতে ইমারত' এবং পাঁচ বছর যাবত ব্যাপক দাওয়াত ও তাবলীগ (১২৩১-৩৬/১৮১৬-২১ খৃঃ ২. হজ্জের সফর : সৌরবর্ষ হিসাবে ২ বছর ১০ মাস আটাশ দিন (১২৩৬-৩৯/১৮২১-২৪ খৃঃ) ৩. জিহাদের সক্রিয় প্রস্তুতি ও দেশব্যাপী সফর প্রায় দু'বছর (১২৩৯-৪১/১৮২৪-২৬) ৪. হিজরত, জিহাদ ও শাহাদত : ১২৪১ হিজরীর ৭ই জমাদিউছ ছানী মোতাবেক ১৮২৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী সোমবার হ'তে ১২৪৬ হিজরীর ২৪শে যুলকা'দা মোতাবেক ১৮৩১ সালের ৬ই মে শুক্রবার পূর্বাহ্ণ পর্যন্ত মোট পাঁচ বছর তিন মাস উনিশ দিন। চারটি স্তরে সর্বমোট প্রায় ১৫ বছর।

১ম স্তর : বায়'আতে ইমারত-দা'ওয়াত ও তাবলীগ (১২৩১-৩৬/১৮১৬-২১ খৃঃ)

১২৩১ হিজরীতে দিল্লীতে সৈয়দ আহমাদের হাতে 'বায়'আতে ইমারত' শেষে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' আল্লামা ইসমাঈল ও 'শায়খুল ইসলাম' আল্লামা আবদুল হাইসহ[১৯২] কমবেশী বিশজন সেরা আলিম ও বন্ধুবান্ধবসহ আমীর সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী মুহাররম ১২৩৪/নভেম্বর ১৮১৮ সালে দিল্লী হ'তে সারা ভারতবর্ষে ব্যাপক তাবলীগী সফরে বের হন।[১৯৩] ইতিপূর্বে তাঁরা দিল্লী ও আশপাশে তাবলীগ করেন। অলৌকিক বক্তৃতা প্রতিভার অদিকারী আল্লামা ইসমাঈলের নছীহত ও বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে লোকেরা বিভিন্ন কুসংস্কার হ'তে তওবা করে এবং দলে দলে সৈয়দ আহমাদের নিকটে বায়'আত করতে থাকে। সর্বত্র তাঁরা শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাথে সাথে সকলকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। এইভাবে প্রায় পাঁচ বৎসর যাবত ব্যাপক দাওয়াত ও তাবলীগের ফলে একদিকে যেমন বায়'আতকারীর সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে তেমনি শিখ ও ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে আগামী দিনের সর্বভারতীয় মুজাহিদ নেতা হিসাবে তাঁদের ভাবমূর্তি সর্বসাধারণের হৃদয় গ্রথিত হয়ে যায়।

২য় স্তর : হজ্জের সফর (১.১০.১২৩৬ হিঃ - ২৯.৮.১২৩৯ হিঃ / ২.৬.১৮২১ খৃঃ - ৩০.৪.১৮২৪ খৃঃ) :

জলপথে পর্তুগীজদের ভয়ে ভারতের একদল আলিম 'এখন হজ্জের ফরযিয়াত মুলতবী হয়ে গেছে' এই মর্মে ফৎওয়া জারি করলে[১৯৪] তার প্রতিবাদে প্রথমে আল্লামা ইসমাঈল একটি ফৎওয়া লিখে বিলি করেন। অতঃপর হিম্মতহারা মুসলমানদের হিম্মত ফিরিয়ে আনার জন্য ধনী-নির্ধন সকল মুসলমানকে তাঁদের সাথে হজ্জে যাওয়ার জন্য আমীরের নির্দেশক্রমে ব্যাপক ঘোষণা জারি করলেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, একেবারে কপর্দকশূন্য অবস্থায় পাঁচটি জাহাযে চারশত নর-নারী নিয়ে ১লা শাওয়াল ১২৩৬ হিজরী মোতাবেক ১৮২১ সালের ২রা জুন তারিখে ঈদুল ফিৎরের ছালাত শেষে তাঁরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রায়বেরেলী ত্যাগ করেন। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বশীল শাহ ইউসুফ ফল্‌তীর নিকটে মাত্র সাত টাকা অবশিষ্ট ছিল। সেটাও মিসকীনদের মধ্যে দান করে দিয়ে রওয়ানার সময় রিক্তহস্ত আমীর সৈয়দ আহমাদ আল্লাহ্‌র নিকটে সফরের সফলতার জন্য করুণকণ্ঠে দো'আ করেন। সাথীদের নির্দেশ দিলেন যেন কারু কাছে কিছু না চায় এবং কোন অবস্থায় তাক্বওয়া পরিত্যাগ না করে। এ যেন ছিল জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাওয়ার সময় তালূত কর্তৃক সৈন্যদের পিপাসা পরীক্ষার ন্যায়। কলিকাতায় নভেম্বর ১৮২১ হ'তে প্রায় তিন মাস অবস্থানের পর মোট দশটি জাহাযে ৭৫৩ জন হাজী নিয়ে কাফেলা জেদ্দার পথে রওয়ানা হয়ে যায়। এখানেই সর্বাাপেক্ষা বেশী লোক বায়'আত করেছিল। ধনী ব্যবসায়ী মুনশী আমীনুদ্দীন, মৌলবী ইমামুদ্দীন বাংগালী প্রমুখ বায়'আত করার সাথে সাথে উদারহস্তে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। ৭/৮ মাস হারামাইনে কাটিয়ে ২ বছর ১০ মাস ২৮ দিন পর ২৯শে শা'বান ১২৩৯ মোতাবেক ১৮১৪ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে রামাযানুল মুবারকের পূর্বদিন এই বিরাট কাফেলা রায়বেরেলী ফিরে আসে ও বিদায়ী ভোজপর্ব শেষে তখনও দশহাযার টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, যা বায়তুল মালে জমা করা হয়।[১৯৫] আল্লাহ্‌র উপরে তাওয়াক্কুলের এই অনন্য দৃষ্টান্ত ভবিষ্যত মুজাহিদগণের জন্য প্রেরণা হয়ে থাকবে।

---

১৯০. জীবনীকার মিরযা হায়রাত দেহলভী, 'হায়াতে তাইয়িবা' (লাহোর : মাকতাবাতুস সালাম ১৯৫৮) পৃঃ ১৯০; অন্য জীবনীকার গোলাম রসূল মেহের এই সফরের ঘটনাকে 'নিছক কাহিনী' বলেছেন। -মেহের, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৮; শাহ ইসমাঈলকে 'কাফের' আখ্যায়িত করা হয় ও তাঁকে হত্যা করার জন্য চারজন গুন্ডা নিযোগ করা হয়। দ্র. মিরযা, হায়াতে তাইয়িবা পৃঃ ১৪১,১৪৪।

১৯১. মাসঊদ আলম নাদভী, 'হিন্দুস্তান কি পহেলী ইসলামী তাহরীক' (দিল্লীঃ মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ২য় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৮১) পৃঃ ২৬।

১৯২. উস্তাদ শাহ আবদুল আযীয তাঁর প্রিয় ছাত্রদ্বয়কে এই লকবে ডাকতেন। -মেহের, 'সাইয়িদ আহমাদ শহীদ' পৃঃ ১১৮।

১৯৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৫।

১৯৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৬।

১৯৫. 'পহেলী তাহরীক' পৃঃ ২৬; মেহের, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮৩, ২০৮, ২৩১।

৩য় স্তর : হিজরত, জিহাদ ও শাহাদাত (৭.৬.১২৪১-২৪.১১.১২৪৬ হিঃ / ১৭.১.১৮২৬-৬.৫.১৮৩১ খৃঃ)

(......... ১২৩৩ বাং সোমবার) হ'তে ১৭ই বৈশাখ ১২৩৮ বাং শুক্রবার পূর্বাহ্ন পর্যন্ত সৌরবর্ষ হিসাবে পাঁচ বছর তিন মাস ঊনিশ দিন।)

হারামাইন শরীফাইন হ'তে প্রত্যাবর্তনের পর সর্বত্র জিহাদের দাওয়াতের কাজ শুরু হয়ে যায়। রায়বেরেলী হ'তে আমীর সৈয়দ আহমাদ নিজে এবং ভারতের অন্যত্র আল্লামা ইসমাঈল ও আল্লামা আবদুল হাইয়ের ব্যাপক তাবলীগী সফর চলতে থাকে। কুরআন ও হাদীছভিত্তিক জীবন গঠন, সমাজ-সংগঠন, মুসলমানদের উপরে অমুসলিম শাসকদের ব্যাপক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্যাতনের বিরুদ্ধে জিহাদী জাযবা পুনরুদ্ধার ইত্যাদিই ছিল তাদের বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু। শাহ ইসমাঈল তাঁর সকল বক্তব্যে একথা পরিষ্কার করে তুলে ধরেন যে, মুসলমানদের সামনে এখন তিনটি পথ খোলা রয়েছে। ১. তাকে 'হক্ব' ছেড়ে বাতিলকে আঁকড়ে ধরতে হবে ২. হক্ব-এর উপরে দৃঢ় থাকার কারণে বাতিলপন্থীদের হামলায় ধৈর্য ধারণ করতে হবে ৩. অথবা বাতিলকে সাহসের সঙ্গে মুকাবিলা করে হক্ব-এর সার্বিক বিজয়লাভের পথ সুগম করতে হবে। তিনি জাতিকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন যে, প্রথমটি কোন বাঁচার রাস্তা নয় বরং ওটাই প্রকৃতপ্রস্তাবে মরণের রাস্তা। দ্বিতীয়টির পরিণতি বেশীর বেশী এটাই হবে যে, তিলে তিলে মরতে হবে। কেবলমাত্র তৃতীয় পথটিই এখন আমাদের জন্য খোলা রয়েছে। আর সেটা হ'ল সরাসরি সম্মুখ মোকাবিলা বা জিহাদ। জিহাদ ত্যাগ করার কারণেই আজ মুসলমান সর্বত্র মার খাচ্ছে। দশ হাযার মাইল দূর থেকে নৌকা চালিয়ে বণিকের বেশে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক এদেশে এসে যুগ যুগ ধরে বসবাসকারী মুসলিম শক্তিকে আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী বিশাল ভারতীয় ভূখন্ডের শাসন ক্ষমতা হ'তে উৎখাত করল। অথচ মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থে-বিত্তে, অভিজ্ঞতায় ও অস্ত্রশক্তিতে সেরা হওয়া সত্ত্বেও নির্বিবাদে মার খেয়ে যাচ্ছে। কেউ আপোষ করছে, কেউ এটাকে কপালের লিখন ধরে নিয়েছে, কেউ আপোষ করতে না পেরে ধুকে ধুকে মরছে। আর মুষ্টিমেয় কিছু লোক আত্মমর্যাদায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের পরিকল্পনা করছে। তিনি সৈয়দ আহমাদের নেতৃত্বে জানমাল দিয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য সকল ভারতীয় মুসলমানের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।[১৯৬] দেশব্যাপী এই প্রচারণার ফলে একদিকে যেমন মুসলমানরা জিহাদে উদ্বুদ্ধ হ'তে থাকেন, অন্যদিকে শাহ ইসমাঈলের আপোষহীন ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং কুরআন ও হাদীছের প্রতি দাওয়াতের ফলে সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলন জোরদার হ'তে থাকে।

এইভাবে দীর্ঘ এক বৎসর দশ মাস যাবৎ সর্বত্র দাওয়াতী সফর শেষে জিহাদে গমনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জিহাদের স্থান হিসাবে সীমান্ত এলাকাকে নির্বাচন করা হয়।

কারণ (১) সারা হিন্দুস্থানে কোথাও এমন স্বাধীন ও নিরাপদ স্থান ছিল না, যাকে জিহাদের কেন্দ্র বানানো যেতে পারে। (২) সীমান্তের স্বাধীন মুসলিম স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিরা বলেছিলেন যে, আমাদের ওখানকার লোকেরা শিখদের যুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে আছে। অতএব সেখান থেকে জিহাদ শুরু করলে লাখ লাখ লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জিহাদে যোগ দিবে। তাছাড়া আমাদের জাতি জন্মযোদ্ধা। তাদেরকে বিশেষ ট্রেনিং না দিলেও চলবে (৩) সর্বোপরি পাহাড়-জংগলের এলাকা হওয়ার কারণে যে কোন সুশিক্ষিত নিয়মিত বাহিনীকে মোকাবিলা করা কেবল সেখানেই সম্ভব (৪) সীমান্ত এলাকা ব্যতীত হিন্দুস্থানের অন্যত্র মুসলিম নওয়াবেরা সকলে ইংরেজ আশ্রিত ছিলেন (৫) সীমান্ত প্রদেশ ও তৎসন্নিহিত এলাকাসমূহের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা যথেষ্ট ছিল। অমুসলিম শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের সমর্থন পাওয়া গেলে জিহাদে জয়লাভ একরূপ নিশ্চিত বলা যায়। সবদিকে বিবেচনা করে হিন্দুস্তানে বিভিন্ন এলাকার পক্ষ হ'তে দাবী থাকা সত্ত্বেও সৈয়দ আহমাদ ও শাহ ইসমাঈল অবশেষে সীমান্ত এলাকাকেই জিহাদ শুরুর কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।[১৯৭]

অগ্রগামী বাহিনী, দক্ষিণ বাহু, বামবাহু, রসদবাহী দল ও মূলবাহিনী সহ পাঁচটি বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক আমীরের দায়িত্বে সোপর্দ করে ১২৪১ হিজীরর ৭ই জমাদিউছ ছানী মোতাবেক ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী সোমবার সৈয়দ আহমাদের জন্মগ্রহণ অযোধ্যার রায়বেরেলীর 'তাকিয়া' গ্রাম হ'তে জিহাদী কাফেলা আল্লাহ্‌র নামে রওয়ানা হয়ে যান। মুজাহেদীনের প্রাথমিক সংখ্য পাঁচ-ছয়শ' ছিল।[১৯৮] তবে রাস্তায় চলার পথে বহু লোক তাদের সঙ্গী হয়েছিলেন একথা প্রায় সকল জীবনীকার বলেছেন।

জিহাদে গমনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে চরদিক হ'তে ত্যাগ ও কুরবানীর বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। দলে দলে লোক মুজাহেদীনকে বিদায় জানাতে আসেন। আশ্রুসজল নেত্রে সকলেই কিছু না কিছু 'হাদিয়া' দিয়ে জিহাদে শরীক হওয়ার ছওয়াব লাভের চেষ্টা করেন। দশমাসের দীর্ঘ সফরে প্রায় তিন হাযার মাইল পথ পরিক্রমায় শ্রান্ত-ক্লান্ত মুজাহেদীনের ভাগ্যে এক মুহূর্ত বিশ্রামের অবকাশ হ'ল না। পথিমধ্যে সিন্ধু, হায়দরাবাদ, বেলুচিস্তান, কান্দাহার, গযনী, কাবুল সকল এলাকার শাসক ও আমীরদের নিকট জিহাদে অংশগ্রহণের আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হওয়ায় সৈয়দ আহমাদ ও শাহ ইসমাঈলের পূর্বের ধারণা বানচাল হয়ে গিয়েছিল। তবুও তাঁরা ভাবতে পারেননি যে, এরা মুসলমান হয়ে এদেরই শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুজাহিদদের বিরোধিতায় যোগদান করবে। সরলপ্রাণ বীরহৃদয় শাহ ইসমাঈল অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হলেও এত সংকীর্ণ চিন্তায় তিনি বা তাঁর সাথীরা কখনোই অভ্যস্ত ছিলেন না। সীমান্তের শী'আ ও পাঠান সর্দাররা যে কত ধূর্ত ও মুনাফিক চরিত্রের হ'তে পারে তা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের নিকট প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আমীর সৈয়দ আহমাদ নির্দেশ দিলেন 'কেউ যেন পোষাক পরিবর্তন না করে। যে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় যেন জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।' মাত্র সাত মাইল দূরে আকূড়াতে অত্যাচারী শিখ রাজা রনজিৎ-এর সেনাপতি বুধ সিং ৮টি কামানসহ দশ হাযার সৈন্য নিয়ে শিবির গেড়েছে দেড় হাযার দীনহীন মুজাহিদের মুকাবিলা করার জন্য।[১৯৯] পেশোয়ারের নওশেরাঁ এলাকাই ছিল শিখ নির্যাতনের মূল উৎসস্থল।[২০০] শুরু হ'ল সোয়া পাঁচ বছর ব্যাপী জিহাদ ও শাহাদতের রক্ত রঞ্জিত জান্নাতী ইতিহাস।

দুর্ভাগ্য এই যে, অধিকাংশ স্থানেই স্থানীয় মুসলিম সর্দারদের বিশ্বাসঘাতকতা গাযীদের বেশী ক্ষতি করেছিল। তাদের মধ্যে 'ইসলামিয়াত'-এর চাইতে 'আফগানিয়াত' এবং বংশীয় ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ বেশী ক্রিয়াশীল ছিল। ফলে সৈয়দ আহমাদের জিহাদের তাৎপর্য বুঝতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। যুদ্ধগুলোর মধ্যে কেবল ১ম ও ২য় যুদ্ধটি সরাসরি শিখদের সাথে হয়। বাকী প্রায় সবগুলো যুদ্ধ বিশ্বাসঘাতক স্থানীয় মুসলিম সর্দারদের সাথে সরাসরি অথবা ইংরেজ-শিখ-মুসলিম মিলিত শক্তি কিংবা শিখ-মুসলিশ যৌথ বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। *[ক্রমশ]*

[লেখক : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' শীর্ষক গ্রন্থ। পৃঃ ২৫৯-২৬৪]

১৯৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩৪-৩৮।

১৯৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬৪-৬৭।

১৯৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৬৮, ২৭০।

১৯৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩২।

২০০. আবু ইয়াহ্‌ইয়া ইমাম খান নওশাহরাবী, 'তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ' (লায়ালপুর-পাকিস্তানঃ জামেয়া সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৯১/১৯৮১) পৃঃ ১০৫।

আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রদত্ত ভাষণ

রাজশাহীর অভিভাষণ

[বাংলা ১৩৫৫ সাল ২৮শে ফাল্গুন মুতাবেক ১৯৪৯ ইং ১২ মার্চ তারীখে রাজশাহীর উপকণ্ঠ নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত আহলেহাদীছ কন্‌ফারেন্সে তৎকালীন 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রদত্ত অভিভাষণ]

(২য় কিস্তি)

হিন্দে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইলমী সনদ :

হাদীছ শাস্ত্রের বিশ্বস্ত ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ মাশারেকুল আনওয়ারের সঙ্কলয়িতা লাহোরের বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন হায়দার ছাগানী (৫৭৭-৬৫০ হিঃ) তাবাকাতের গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত বিশ্ব-বিশ্রুত পুরুষ। তিনি বাগদাদের খলীফাগণের দৌতকার্যে বহুবার দিল্লী গমনাগমন করেন। বাগদাদেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তাঁহার হাদীছের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ এবং নির্দিষ্ট দলীয় মাযহাব অনুসরণের প্রতি অশ্রদ্ধার কথা তিনি তাঁহার গ্রন্থেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দের সহিত তাঁহার ইলমী যোগাযোগের বিবরণ আমি বিশদরূপে অবগত হইতে পারি নাই। তাঁহার পরে পরেই অর্থাৎ শায়খুল ইসলাম তাক্বীউদ্দীন ইবনে তায়মিয়াহর (৬৬১-৭২৮ হিঃ) সমসাময়িক আর একজন অনন্য সাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন হিন্দে আহলেহাদীছ মুহাদ্দিছের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। আল্লামা হাফিয আবুল খায়ের নাজমুদ্দীন সাঈদ বিন আবদুল্লাহ জালালী দেহলভী (৭১২-৭৪১ হিঃ), ইমাম ইবনে তায়মিয়াহর ছাত্র ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হিঃ), হাফিয শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমদ বিন আব্দুল হাদী আল-মাক্বদেসী (৭০৬-৭৪৪ হিঃ) প্রভৃতির উসতায ছিলেন। রিজাল শাস্ত্রের ইমামরূপে যাহাবীর খ্যাতির কথা কাহারো অবিদিত নাই, কিন্তু ইবনে আব্দুল হাদীও ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। স্বীয় গুরু ইবনে তায়মিয়াহকে সমর্থন করিয়া তিনি হাফিয তাক্বীউদ্দীন সুবকীর (৬৮৩-৭৫৬ হিঃ) বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। হাকিম আবুল ফযল যায়নুদ্দীন আব্দুর রহীম ইরাক্বী (৭২০-৮০৬ হিঃ) ইবনে আব্দুল হাদীর ছাত্র ছিলেন। আর ইরাক্বীর ছাত্র ছিলেন শায়খুল ইসলাম হাফিয শিহাবুদ্দীন আবুল ফযল আহমদ বিন আলী বিন হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ)। ইবনে হাজারের দুই জন ছাত্র সমধিক প্রসিদ্ধ লাভ করেন। একজন হইতেছেন হাফিয শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আম-সাখাবী (৮৩১-৯০২ হিঃ), দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম শায়খুল ইসলাম আবু ইয়াহইয়া যাকারিয়া বিন মুহাম্মাদ আনছারী (৮২৬-৯২৬ হিঃ)। কনযুল উম্মাল নামক হাদীছকোষ (Encyclopaedia) সঙ্কলয়িতা যুগ প্রবর্তক আল্লামা শায়খ ওয়ালিউল্লাহ আলী বিন হুসামুদ্দীন আল-মুত্তাক্বী (৮৮৫-৯৭৫ হিঃ) সাখাবীর ছাত্র এবং জৌনপুরের অধিবাসী ছিলেন। নির্দিষ্ট মাযহাবের (School) অনুসরণের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) হাদীছকে সকল অবস্থায় অগ্রগণ্য করার রীতি জৌনপুরীর অনেক পূর্বে অর্থাৎ ইমাম ইবনে তায়মিয়াহর সমসাময়িক আর একজন পুরুষসিংহ হিন্দ ভূমিতে প্রচলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সুলতানুল মাশায়েখ আল্লামা শায়খ নিযামুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আলী আল-বুখারী দেহলভী। ইনি সাধারণের নিকট নিযামুদ্দীন আউলিয়া নামে প্রসিদ্ধ। বাদায়ূন শহরে ৬৩৪ হিজরীর সফর মাসে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৭২৫ হিজরীর ১৮ রবিউল আউওয়াল তারীখে তিনি দিল্লীতে পরলোকগমন করেন। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে গৌড়ের শায়খ সিরাজুদ্দীন ওছমান অন্যতম। শায়খ আলাউদ্দীন লাহোরী তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তদীয় পুত্র স্বনামধন্য শায়খ নূর কুতুবে 'আলম ৮১৩ হিজরীতে পাণ্ডুয়ায় পরলোকবাসী হন। জৌনপুরীর হিন্দী ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে শায়খ আব্দুল হক্ব দেহলভীর (৯৫৮-১০৫২ হিঃ) উস্তায শায়খ আব্দুল ওয়াহ্হাব মুস্তাকী বুরহানপুরী (মৃত ৯৩৬ হিঃ), হাদীছের শব্দকোষ মাজমাউল বিহার ও তাযকিরাতুল মাওযু'আত প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শায়খ মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী নহ্‌রওয়ালী (৯১৪-৯৮০ হিঃ) ও শায়খ কুতুবুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আলাউদ্দীন আহমাদ নহ্‌রওয়ালী (মৃত ৯৮৮ হিঃ) বিশষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পাট্টানী বিদ'আতের প্রতিরোধ করিতে গিয়া ঘাতকের হস্তে শহীদ হন। নহ্‌রওয়ালীর দুইজন ছাত্র বিশেষভাবে কৃতিত্ব অর্জন করেন। যথা : আল্লামা শায়খ আবুল মা'আবী সিন্ধী (মৃত ১০৮৮ হিঃ) ও সুবর্ণ (আহমার) আব্দুল্লাহ বিন মোল্লা সা'আদুল্লাহ লাহোরী। ১০৮৩ হিজরীতে হেজায ভূমিতে পরলোকগমন করেন। তাঁহার ৪৯ বৎসর পূর্বে মুজাদ্দিদে আলফুছ্ছানির বিয়োগ ঘটে। তাঁহার সহিত মুজাদ্দিদের সাক্ষাৎকারের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আল্লামা মুজাদ্দিদের উস্তাযগণের মধ্যে আব্দুর রহমান বিন ফাহাদ, মোল্লা কামালুদ্দীন কাশ্মিরী প্রভৃতির সহিত জৌনপুরী সিলসিলার কোনরূপ যোগাযোগ ছিল কিনা তাহাও আমার জানা নাই। মুজাদ্দিদের বাঙালী শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে বর্ধমানের শায়খ হামীদ মঙ্গলকোটী সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

এ কথা বারংবার বলা হইয়াছে যে, দলবন্দীর (মাযহাব) বেড়াজালকে ছিন্ন করিয়া বিক্ষিপ্ত ও বিভক্ত মুসলিম জাতিকে কুরআন ও হাদীছের কেন্দ্রে এক মহাজাতিরূপে সমবেত করা **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর অন্যতম লক্ষ্য। প্রথম সহস্রক হইতে রাষ্ট্রীয় পতনের সাথে সাথে গতানুগতিকতা ও দলীয় গণ্ডীর প্রভাব মুসলমানগণের সমাজ ও ধর্মজীবনে এরূপ দৃঢ়ভাবে চাপিয়া বসিয়াছিল যে, শ্রেণীভেদ ও অন্ধ অনুসরণের বন্ধনকে অস্বীকার করার কথা উচ্চারণ করাও মহাপাপ বিবেচিত হইত। ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে মান্য করিয়া লওয়া হইয়াছিল যে প্রচলিত চারি মাযহাব : হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীর মধ্যে শুধু একটিকেই অবধারিতরূপে বরণ করিয়া লওয়া ওয়াজিব। যুগ প্রবর্তক আলী মুত্তাক্বী মক্কায় যে দারুলহাদীছ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং মুজাদ্দিদে আলফুছ্ছানি সুন্নাতের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে সংস্কারের যে তূর্যধ্বনি করিয়াছিলেন, এতদুভয়ের কল্যাণে গতানুগতিকতা ও মাযহাবের জগদ্দল প্রস্তর দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ করে। ইলমে হাদীছের পবিত্র পরশ লাভ

করার ফলে তাক্বলীদ-উষর হিন্দ ভূমিতেও মাঝে মাঝে মুক্তি ও বিদ্রোহের ঝঙ্কার শুনা যাইতে থাকে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে হাজারের অপর ছাত্র যাকারিয়া আনছারী হাফিয নাজমুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আলগিতী সেকান্দারীর (৯১০-৯৮৪ হিঃ) উস্তায ছিলেন। নাজমুদ্দীনের দুইজন ছাত্র শায়খ শিহাবুদ্দীন আহমাদ বিন খলীল সুব্কী ও আবুন্নাজা' সালিম বিন আহমাদ বিন সালামাহ বিন ইসমাঈল মাযাহী আযহারী সুব্কীর এবং শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আলাউদ্দীন মিছরী বাবলী (মৃত ১০৭৭ হিঃ) সিনহোরীর ছাত্র ছিলেন। জগত-প্রসিদ্ধ আলেম, মাদীনার স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ শায়খ জামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ বিন সালেম বছরী (১০৪৯-১১৩৪ হিঃ) ও শায়খ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ নাখলী বাবলীর বিশিষ্ট ছাত্র এবং বাবলী, মাযাহী ও সুবর্ণ লাহোরী বিদ্যার ত্রিস্রোতা সঙ্গম লাভ করিয়াছিল আল্লামা শায়খ বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম বিন হাসান বিন শিহাবুদ্দীন কুদ্দীর (১০২৫-১১০২ হিঃ) ভিতর। ইবরাহীম কুদ্দীরপুত্র আল্লামা শায়খ আবু তাহের মুহাম্মাদ মাদানী (মৃত ১১৪৫ হিঃ) স্বীয় পিতা ও আব্দুল্লাহ বিন সালামা বছরী ও শায়খ আহমাদ নাখলীর জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন। উত্তরকালে আব্দুল্লাহ বিন সালেম বছরী ও আবু তাহের মাদানীর ছাত্রবৃন্দই হেজায, নজদ, ইয়ামান ও হিন্দভূমিতে নবযুগের রচয়িতা ও **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর অগ্রনায়কে পরিণত হইয়াছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন সালেম বসরীর ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ হায়াৎ সিন্ধী (মৃত ১১৬৩ হিঃ) বুখারীর টীকা লেখক আল্লামা শায়খ আবুল নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল হাদী সিন্ধী (মৃত ১১৩৯ হিঃ) ও আলহাজ শায়খ মুহাম্মাদ আফযাল সিয়ালকোটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইয়ামনের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কারক ও আহলেহাদীছ ইমাম সৈয়দ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল সালাহ ছান'আনী (১০১১-১১৮২ হিঃ) ও হিন্দের আহলেহাদীছ ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম শায়খ আহমাদ ওয়ালিউল্লাহ কুতুবুদ্দীন বিন আব্দুর রহিম দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হিঃ) আব্দুল্লাহ বিন সালেম ও আবু তাহের মাদানী উভয়ের ছাত্র ছিলেন। মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আবুল হাসান সিন্ধীর নিকট হইতেও বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন।

মুহাম্মাদ হায়াৎ সিন্ধীর ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে সুকবি ও মুহাদ্দিছ আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ ফাখের ইলাহাবাদী (১১২০-১১৬৪ হিঃ) নাজদের বহু বিশ্রুত ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী তমীমী (১১১৫-১১৭১ হিঃ) ও ইয়ামানের আল্লামা সৈয়দ আব্দুল কাদের বিন আহমাদ বিন আব্দুল কাদের বিন আন-নাছের বিন আব্দুল রব সান'আনী (১১৩৫-১২০৭ হিঃ) ইসলাম জগতে নবযুগের দীপালী সদৃশ।

আলহাজ শায়খ মুহাম্মাদ আফযাল সিয়ালকোটীর ছাত্র ছিলেন আল্লামা কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথীর দীক্ষাগুরু হিন্দ-গৌরব মীরযা মাযহার জানে জাঁবিনে মীরযা জান দেহলভী। আল্লামা সৈয়দ আব্দুল কাদের ছান'আনী ইয়ামানের আহলেহাদীছগণের ইমাম বিখ্যাত উছূলী ও মুহাদ্দিছ সুপ্রসিদ্ধ ফিক্বহুল হাদীছ নায়লুল আওতার ও আস্‌সায়লুল জাব্বার এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা মুহাম্মাদ বিন আলী শাওক্বানীর (১১৭৩-১২৫০ হিঃ) উস্তাযগণের অন্যতম। হিন্দের আহলেহাদীছ শিক্ষকগণের নিকট হইতে তাঁহার উস্তায যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার উপযুক্ত অধিকারী ও ধারক ছিলেন। পরবর্তীকালে হিন্দের **আহলেহাদীছ আন্দোলন** তাঁহার প্রদত্ত প্রেরণার কিভাবে বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল কিছুক্ষণ পরেই তাহা জানা যাইবে।

হুজ্জাতুল ইসলাম আহমাদ অলিউল্লাহ দেহলভীর বিরাট শিষ্য বাহিনীর মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উল্লেখযোগ্য : তদীয় পুত্রগণ যথা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ (১১০১-১২৩৯ হিঃ), শাহ রফীউদ্দীন (মৃত ১২৪৯ হিঃ), শাহ আব্দুল কাদের (মৃত ২৪২ হিঃ), শাহ আব্দুল গণী (মৃত ২২৭ হিঃ), কাযী সানাউল্লাহ মাযহারী পানিপথী (মৃত ১২২৭ হিঃ), আরবী শব্দকোষ তাজুল উরূসের সঙ্কলিয়তা সৈয়দ মর্তুযা বেলগ্রামী যাবিদী (ইনি শায়খ মুহাম্মাদ ফাখের ইলাহাবাদী এবং সৈয়দ আব্দুল কাদের ছান'আনীরও ছাত্র ছিলেন), এই সুত্রে ইমাম শাওকানীর সহাধ্যায়ী ভ্রাতা হইতেন। তিনি একশত হিজরীর পর মিছরে পরলোক গমন করেন। দেরাসাতুল লাবীব গ্রন্থ প্রণেতা মুহাম্মাদ মুঈন সিন্ধী, শায়খ মুহাম্মাদ আমিন ফুলতী (ইনি শাহ ছাহেবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বিশেষ ভক্ত ছিলেন, তাঁহার অনুরোধক্রমেই শাহ ছাহেব তাঁহার অমর গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা রচনা করিয়াছিলেন, শায়খ রফিউদ্দীন মুরাদাবাদী মাওলানা খায়রুদ্দীন সুরতী, শায়খ জারুল্লাহ বিন আব্দুল রহীম লাহোরী মাদানী, সৈয়দ মুহাম্মাদ আবু সঈদ ব্রেলভী (আমীর সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর পিতামহ)। মুসনাদুল হিন্দ, ইমামুল মুফাস্‌সিরীন শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভীর ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তারজামাতুল কুরআন শাহ রফিউদ্দীন ভ্রাতুষ্পুত্র মুজাদ্দিদে ইসলাম আল্লামা মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬ হিঃ), আমীরুল মুমেনীন সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী (১১০১-১২৪৬ হিঃ), ভাগিনে আল্লামাতুল হিন্দ শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক (১১৯২-১২৬২ হিঃ), শাহ মুহাম্মাদ ইয়াকুব (মৃত ১২৮৩ হিঃ), শাহ আব্দুল হাই বুরহানপুরী (মৃত ১২৪৩ হিঃ), মুফতী সাদরুদ্দীন খান দেহলভী (মৃত ১২৮৫ হিঃ), মীর মাহবুব আলী দেহলভী, সৈয়দ আব্দুল খালেক, শাহ ফযলুর রহমান গঞ্জ মুয়াদাবাদী, মাওলানা খুররম আলী সৈয়দ, হায়দর আলী রামপুরী, মুজাহিদ, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রামপুরী, মুজাহিদ, আল-ফুস্‌সানীর প্রপৌত্র শাহ আবু সাঈদ মাওলানা সালামাতুল্লাহ বাদায়ূনী, মাওলানা সৈয়দ আওলাদ হাসান কেন্নোজী (১২১০-১২৫৩ হিঃ), শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিছ বানারাসী (১২০৬-১২৮৬ হিঃ), আল্লামা আসাদ আলী চট্টগ্রাম ও মাওলানা ইমামুদ্দীন নোয়াখালী হাজীপুর, সা'আদুল্লাপুর নিবাসী বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

মুজাদ্দিদে ইসলাম আল্লামা ইসমাঈলের সমস্ত জীবন সক্রিয় রাজনীতি চর্চা এবং জিহাদের কার্যে অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া

ছাত্রবৃন্দের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে নাই। তাঁহার বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দের মধ্যে শহীদের বেশ্যাপল্লীর তাবলীগের সহচর মাওলানা আব্দুছ ছামাদ বাঙ্গালী ও নওশহ্রা যুদ্ধের শহীদ বরকতুল্লাহ বাঙ্গালী কোন্ স্থানের অধিবাসী ছিলেন তাহা আমি জানিতে পারি নাই। তাঁহারা ছাড়া আল্লামা শহীদের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে বর্ধমানের আল্লামা যিল্লুর রহীম মঙ্গলকোটী ও পাটনার ছাদিকপুরের অধিবাসী কুতুবুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন মাওলানা বিলায়েত আলী (১২০৫-১২৬৯ হিঃ) বিন ফাতহে আলী বিন ওয়ারিছ আলী বিন মোল্লা মুহাম্মাদ সাঈদ বিন কাযী আব্দুল্লাহ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। মাওলানা বেলায়েত আলী বিহারের বিখ্যাত সাধক মাখদুম ইয়াইয়ার মুনায়রীর বংশধর।

আমীর সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব যাঁহারা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন অথবা তাঁহার মিশনের সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎভাবে যোগাযোগ ছিল, তাঁহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তাঁহার জীবনী লেখকগণ তদীয় বাঙ্গালী সহকর্মী ও শিষ্যবৃন্দের আলোচনা এবং তাঁহাদের আত্মদান কাহিনী একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহার পশ্চিম দেশীয় সহযোগী ও অনুচরগণ অপেক্ষা বাংলার মন্ত্রশিষ্য ও অনুসারীগণের বেশী করিয়া উল্লেখ করিব। মুজাদ্দিদ আল্লামা ইসমাঈল শহীদ, আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক দেহলভী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব, মাওলানা আব্দুল হাই, মাওলানা বেলায়েত আলী, মাওলানা ইনায়েত আলী, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী, শায়খ হাবীবুল্লাহ কান্দাহারী (মাওলানা মুহাম্মাদ দাউদ গযনভী ছাহেবের পিতামহ মাওলানা আব্দুল্লাহ গাযনভীর উস্তায) ও মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ (মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগোহী ও মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর মন্ত্রগুরু)।

বাঙ্গালী শিষ্য

মাওলানা আব্দুছ ছামাদ বাঙ্গালী, বরকতুল্লাহ বাঙ্গালী (পাঞ্জাবের প্রথম জিহাদ নওশহ্রার শহীদ, ২০ শে জামাদিল আউওয়াল, ১২৪২ হিঃ), আল্লামা যিল্লুর রহীম-বর্ধমান, মাওলানা ইমামুদ্দীন-নোয়াখালী, শাহ নূর মুহাম্মাদ নিযামপুর চট্টগ্রাম (ফুরফুরার পীর শাহ সুফী আবুবকর ছাহেবের মন্ত্রগুরু শাহ সুফী ফাতহে আলী ছাহেবের উস্তায), সৈয়দ নিসার আলী উরফে তিতুমীর-২৪ পরগণা, চাঁদপুর হায়দারপুর মাওলানা মানছুরুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন নাওয়াব জামালুদ্দীন আনছারী, ঢাকা (বংশালের মরহুম মাওলানা আব্দুল জব্বার আনছারীর পিতা), হাফিয জামালুদ্দীন–ঢাকা, রিরুয়া, কালিগঞ্জ গাযী রঈসুদ্দীন খান-২৪ পরগণা, হাকিমপুর, মুনশী মুহাম্মাদ যামান, বর্ধমান, চৌঘরিয়া, মুনশী আমীরুদ্দীন–কলিকাতা, বেলেঘাটা, হাজী মুহাম্মাদ হুসাইন-পাবনা, মাওলানা সিরাজুদ্দীন-পাবনা, সিরাজগঞ্জ, শাহবাযপুর, হাফিয আমানতুল্লাহ, হাজী আযহারুদ্দীন, ইনামুল হক্ব, ছূফী আযীযুদ্দীন, মাওলানা আলীমুদ্দীন (কলিকাতার লোয়ার সারকুলার রোডের সঙ্গে তাঁহার নামীয় পথ সংযুক্ত আছে), মাওলানা হাজী রহীমুদ্দীন, শাহ রাসূল মুহাম্মাদ ও হাফিয জামালুদ্দীন (ইহার নামে লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতায় একটি বড় মসজিদ আছে)। শেষোক্ত ব্যক্তিগণের বিশদ পরিচয় আমি উদ্ধার করিতে পারি নাই। হিজায ভ্রমণের সময়ে হাফিযুল বুখারী আল্লামা শায়খ আহমাদ বিন ইদরীস আল-হুসাইনী আল-ইদরীসী (১২১৪-১২৫৩ হিঃ), সৈয়দ হামযা মাক্কী, সৈয়দ আক্বীল মাক্কী, মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ বিন ওমর মাক্কী, শায়খ ওমর বিন আব্দুর রাসূল মুহাদ্দিছ মাক্কী সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর হস্তে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ, মুজাদ্দিদ ইসমাঈল শহীদ ও আমীর সৈয়দ আহমাদ শহীদের ছাত্র ও শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে বেনারসের আল্লামা শায়খ আব্দুল হক্ব বিন ফাযলুল্লাহ মুহাম্মাদ মুহাদ্দিছ, পাটনার কুতুবুল ইসলাম মাওলানা বেলায়েত আলী ও ঢাকার আল্লামা শায়খ মনছুরুর রহমান তাঁহাদের আরব পরিভ্রমণের সময় আনুমানিক ১২৫০ হিজরীতে ইয়ামানে যান ও তদানীন্তন শ্রেষ্ঠতম উছূলী ও মুহাদ্দিছ এবং ইয়ামানের আহলেহাদীছগণের ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানীর নিকট হাদীছ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উচ্চ সনদ লাভ করিতে সমর্থ হন। শায়খ আব্দুল হক্বকে ইমাম শাওকানী যে সনদ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা 'আতহা-ফুল আকা-বীর বি ইসনাদিদ দাফা-তীর' নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রসিদ্ধ। হিন্দের **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর সহিত ইয়ামানী প্রেরণার মণিকাঞ্চন যোগ সঙ্কীর্ণচেতাগণের আদৌ মনঃপুত হয় নাই। কোন নামকরা ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুক্বাল্লিদ আলেম এই বলিষ্ঠ সংযোগের দরুণ **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর পরবর্তী পর্যায়কে যায়দী, নাজ্দী শী'আ আন্দোলন বলিয়া আখ্যায়িত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই এবং শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ, সৈয়দ আহমাদ আমীর ও মুজাদ্দিদ শহীদের প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত ও তাঁহাদের আরব মিশনের ধারকদিগকে সম্পূর্ণভাবে উড়াইয়া দিয়া আর একটি ভুঁইফোর নিষ্ক্রিয় দলের গুণগানে ও তাহাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু বন্ধুগণ, রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) হাদীছের প্রতি অনুরাগ এবং আমল বিল হাদীছের অপরাধের জন্য আমরা সকল প্রকার গালাগালি প্রফুল্ল মনে শুনিতে প্রস্তুত আছি এবং ইমামুল আয়েম্মাহ শাফেঈর সুরে সুর মিলাইয়া বলিতেছি :

ان كان رفقا حب النبي محمد

فليشهد الثقلان اني رافضي!

وما اصلح ما قيل في هذا المقام

به بد مستي سزد كرمهتمت مازد مرا مافي

هنوز از باد سارينه ام سيمانه بودارد!

বিদ'আতীর দল শাহ অলিউল্লাহ এবং তদীয় বংশধরগণের উপর যে অমানবিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার ফলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছের দৃষ্টিশক্তি শৈশব কালেই দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বে চক্ষু একেবারেই নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি আপন কনিষ্ঠ সহোদর শাহ রফীউদ্দীনকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করেন। তাঁহার ইন্তেকালের পর তদীয় ভাগিনেয় আল্লামাতুল হিন্দ শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক বিন শায়খ মুহাম্মাদ আফযাল ফারুক্বী মাতুলের শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি একদিকে জিহাদের রিক্রুটমেণ্ট ও সাহায্যাদি সীমান্তে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করিতেন এবং দিল্লীতে শাহ অলিউল্লাহ ও শাহ আব্দুল আযীযের আসনে বসিয়া হাদীছ, তাফসীর ও ফিক্বহ শাস্ত্র শিক্ষাদান করিয়া সমাগত বিদ্যার্থিগণের পিপাসা নিবৃত্তি করিতেন। বালাকোটের হৃদয়বিদারক ঘটনার ঠিক ২ বৎসর পর মাওলানা বেলায়েত আলী ছাহেবের পরলোক গমনের প্রাক্কালে অর্থাৎ ১২৫৮ হিজরীতে দিল্লী ছাড়িয়া হিজাযে হিজরত করেন এবং মক্কায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁহার ছাত্র বাহিনীর মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহ মুহাম্মাদ ইয়াকুব মুহাজির, মুজাদ্দিদ শহীদের পুত্র শাহ মুহাম্মাদ ওমর, মাওলানা কারামত আলী ইসরাঈলী, নওয়াব কুতুবুদ্দীন খান দেহলভী (মিশকাতের উর্দূ অনুবাদক), স্যার সৈয়দ আহমাদ (আলিগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা), শাহ ফযলুর রহমান গঞ্জমুরদাবাদী (ইনি শাহ আব্দুল আযীযের নিকটও বিদ্যার্জন করিয়াছিলেন), মাওলানা ইবরাহীম নগর নাহসভী, নওয়াব সাদরুদ্দীন খান (ইনি শাহ আব্দুল আযীযের ছাত্র ছিলেন), মাওলানা আহমাদ সাহরাণপুর-(বুখারীর টীকাকার), মাওলানা বাশীরদ্দীন কেন্নোজী (সাওয়াইকে ইলাহিয়া পুস্তকের রচয়িতা), মাওলানা আব্দুল্লাহ ইলাহাবাদী, শায়খ আব্দুল্লাহ সিরাজ মাক্কী, শায়খ মুহাম্মাদ বিন নাছের আল-হাযেমী এবং শায়খুল ইসলাম আল্লামা হাফিয সৈয়দ মুহাম্মাদ নাযির হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ ও শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক দেহলভীর অন্যতম ছাত্র নওয়াব সাদরুদ্দীন খান দেহলভী ভূপালের স্বনামধন্য নওয়াব আল্লামা সৈয়দ সিদ্দীক হাসান বিন সৈয়দ আওলাদ হাসান কেন্নোজীর উস্তায ছিলেন। শাহ ইসহাক দেহলভীর হিজরতের প্রাক্কালে **আহলেহাদীছ আন্দোলন** দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে। আল্লামা শহীদের সময় পর্যন্ত হিন্দ ভূমিতে দিল্লী এই আন্দোলনের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। সক্রিয় রাজনৈতিক বিষয় সমূহের, যেমন সীমান্তে অর্থ ও সৈন্য প্রেরণের কার্যাদি যেরূপ দিল্লী হইতে সমাধা করা হইত, তেমনি আন্দোলনের ইল্মী চর্চার কেন্দ্রস্থলও দিল্লী ছিল। পরবর্তী সময়ে দিল্লীতে ইল্মী চর্চার কেন্দ্র রহিয়া গেল কিন্তু সক্রিয় রাজনীতির কেন্দ্র পাটনায় স্থানান্তরিত হইল। কেন এরূপ ঘটিল তাহার কারণ আমি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু ভাঙ্গনের সুচনা যে শাহ ইসহাক ছহেবের সময়েই দেখা দিয়াছিল, মাওলানা বেলায়েত আলী ছাহেবের জীবদ্দশায় তাঁহার হিজরতের ব্যাপারে তাহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে।

কুতুবুল ইসলাম মাওলানা বেলায়েত আলী **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর সক্রিয় রাজনেতিক শাখার (Active politics) নেতা ছিলেন। আমীর সৈয়দ আহমাদের শাহাদতের সময় তিনি হিন্দের দক্ষিণাংশে প্রচার কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বালাকোটের দুর্ঘটনায় সকলেই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল, একমাত্র তাঁহার তীক্ষ্ণ জ্ঞান, অক্লান্ত অধ্যাবসায় ও অসাধারণ ত্যাগের ফলে আবার আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠে এবং বাঙ্গালা ও হিন্দের বিভিন্ন স্থল হইতে লোকজন ও সাহায্যাদি সীমান্তে প্রেরিত হইতে আরম্ভ করে। মাওলানা বেলায়েত আলী ছাহেবের সহকর্মী ও অনুগামীগণের সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদান করিতেছি : শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক দেহলভী, শাহ মুহাম্মাদ ইয়াকুব দেহলভী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা গাযী ইনায়েত আলী (১২০৭-১২৭৪ হিঃ), মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রামপুরী, মাওলানা যয়নুল আবেদীন, অন্যতম ভ্রাতা মাওলানা তালিব আলী, মাওলানা ফারহত হুসাইন-পাটনা (১২২৬-১২৭৪ হিঃ), জ্যেষ্ঠপুত্র মাওলানা গাযী আব্দুল্লাহ (১২৪৬-১৩২০ হিঃ), অন্যান্য পুত্রগণ যথা হেদায়তুল্লাহ, আব্দুর রহমান ও মাওলানা আব্দুল করীম (জন্ম ১২৫৫ হিঃ), ভ্রাতুষ্পুত্র মাওলানা আব্দুর রহীম, আন্দামানে (মৃত ১২২৩-১২৯৮ হিঃ), তদীয় ভ্রাতৃগণ যথা মাওলানা ফৈয়ায আলী-সীমান্তের স্থানায় মৃত্যু (জন্ম ১২৩৩ হিঃ), মাওলানা ইয়াহ্য়া আলী-আন্দামানে মৃত্যু (১২৪৩-১৮৬৮ খৃঃ), মাওলানা আকবর আলী, মাওলানা জা'ফার আলী, থানেশ্বর আন্দামানের কয়েদী, মাওলানা যিল্লুর রহীম-বর্ধমান, মাওলানা বদীউয্যামান-বর্ধমান (কলিকাতা মিসরীগঞ্জ আহলেহাদীছ মসজিদের মুত্বাওয়াল্লী), মাওলানা আব্দুল জাব্বার, কুমাশী (মিসরীগঞ্জ মসজিদের ইমাম ও আন্দোলন সম্পর্কিত গ্রন্থ সমূহের মুদ্রাকর), জনাব মুফীযুদ্দীন খান-হাকিমপুর, ২৪ পরগণা, জনাব মদন খান-ঐ, জনাব জলীল বখ্শ, বিরুয়া-ঢাকা, মৌলভী নূর মুহাম্মাদ-ঐ, মাওলানা মানছুরুর রহমান আনছারী-ঢাকা, মাওলানা আযীমুদ্দীন-ঢাকা, মাওলানা আমিরুদ্দীন, নারায়ণপুর-মালদহ (আন্দামানের কয়েদী), মুনশী আব্দুল হাদী-পাবনা, মুনশী আব্দুর রহমান খান-পাবনা, খন্দকার নাজীবুল্লাহ-কেশর, রাজশাহী, মাওলানা কারামতুল্লাহ-জামিরা, রাজশাহী, হাজী মনরুদ্দীন-সপুরা, রাজশাহী, খাওয়াজা আহমাদ খলীফা-নদীয়া, জনাব মীয়াজান কাযী-কুমারখালি, কুষ্টিয়া (আম্বালা জেলে মৃত্যু), বখশু মণ্ডল শহীদ-মেটিয়াবুরুজ, কলিকাতা। মাওলানা বেলায়েত আলী ছাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা আব্দুল্লাহ ছাহেবের মৃত্যু অর্থাৎ ১৩২০ হিজরী পর্যন্ত আন্দোলনের সক্রিয় অংশের সহিত বাঙ্গালার যে সকল কৃতী সন্তান যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কে কে মাওলানা বিলায়েত আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎভাবে যুক্ত ছিলেন, তাহা আমি নির্ণয় করিতে পারি নাই। তাঁহাদের মধ্য হইতে কতিপয় নাম উল্লেখ করিতেছি :

মাওলানা ইবরাহীম উরফে আফতাব খান শহীদ-হাকিমপুর, ২৪ পরগণা, মাওলানা আব্দুল বারী ঐ, জনাব ইবরাহীম মণ্ডল-দুম্কা-মুর্শিদাবাদ, মৌলভী রহীম বখশ খান-দিলালপুর, বগুড়া, মাওলানা আব্দুল হালিম ধনারুহা, রংপুর, মাওলানা আতাউল্লাহ, রংপুর, জনাব মাসঊদ খান, বগুড়া (আন্দামানের কয়েদী), জনাব আলে মুহাম্মাদ তালুকদার সন্ধ্যাবাড়ী, বগুড়া, মাওলানা আমীরুদ্দীন দৌলতপুর সিরাজগঞ্জ, মাওলানা ইবরাহীম দেলদুয়ার, মুহাজিরে মাক্কী, জনাব শাকুরুল্লাহ মিঞা, দাউদপুর-রংপুর, মৌলভী আকরম আলী খান দুয়ারী, রাজশাহী, জনাব হাজী বদরুদ্দীন বংশাল, ঢাকা, জনাব আমীর খান, কলিকাতা (আন্দামানের কয়েদী), জনাব আব্দুল হাকিম খান, হাকিমপুর-২৪ পরগণা, জনাব মুআয্যাম সর্দার-ঘোনা, সাতক্ষীরা-খুলনা (আন্দামানের কয়েদী), জনাব তাক্বী মুহাম্মাদ খান শহীদ-বগুড়া, মাওলানা আমীনুদ্দীন বরিশাল-ঢাকা, মাওলানা আব্দুল কুদ্দূস জুঙ্গীপুর, মালদহ-দিনাজপুর, মাওলানা রহীমুল্লাহ নখৈর-দিনাজপুর, মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ, চিরির বন্দর-দিনাজপুর, মাওলানা তরীকুল্লাহ কালীতলা-মুর্শিদাবাদ, আলহাজ্জ নযীরুদ্দীন খান উরফে জীবন খান-২৪ পরগণা (মুর্শিদাবাদ নিযামতের সদরে আলা), খাওয়াজা আহমাদ খলীফা, নদীয়া, খন্দকার যবান আলী পাবনা।

মাওলানা বেলায়েত আলী ছাহেবের সময় হইতে মাওলানা আব্দুল্লাহ ছাহেবের মৃত্যু পর্যন্ত **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর সক্রিয় বিভাগের সহিত সংযুক্ত ব্যক্তিগণের যে তালিকা আমি সংগ্রহ করিয়াছি, যাঁহাদের নাম আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তাঁহাদের সংখ্যানুপাতে এই তালিকা একান্তই অসম্পূর্ণ। যেদিন এই তালিকা পূর্ণ হইবে এবং তালিকার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনকথা লিখিত হইবে, সেইদিন বাঙ্গালার **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর ইতিহাসের এক অংশ সম্পূর্ণ হইবে। আমার জীবন কালে এই কার্য সম্পন্ন হইবে, তাহার আশা নাই।

‘আহলেহাদীস আন্দোলন’ নামক পুস্তকে কিছু চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। দুর্ভাগ্য বশতঃ বাঙ্গালার কেহই এই বিরাট কার্যে উদ্যোগী হন নাই। শিক্ষিত যুবক সন্তানরা এই পথে গবেষণা করিলে বাঙ্গালায় ইসলামী ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় রচিত হইবে।

আমীর সৈয়দ আহমাদ শহীদের অন্যতম খলীফা ও আল্লামা শহীদের ছাত্র মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ মুর্শিদাবাদী ও মাওলানা যিল্লুর রহীম মঙ্গলকোটীর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে রাজশাহী জামিরার মাওলানা কারামাতুল্লাহ, উক্ত যেলার কেশরহাট গ্রামের অধিবাসী মৌলভী খন্দকার আব্দুর রহমান, নদীয়ার খাওয়াজা আহমাদ খলীফা, মৌলবী মুহাম্মাদ ইবরাহীম, পোল্লাডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ ও মুনশী ফসিহুদ্দীন, চাঁদঘর, নদীয়া সমধিক প্রসিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ যেলার নারায়ণপুর, মধ্যবঙ্গে ২৪ পরগণার হাকিমপুর আর উত্তরবঙ্গে রাজশাহী **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর পক্ষে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মাওলানা গাযী ইনায়েত আলী হাকিমপুরকেই তাঁহার মধ্য-বাঙ্গালার প্রচার কেন্দ্রে পরিণত করিয়া ছিলেন আর মাওলানা বেলায়েত আলীর রাজশাহী যেলায় কর্মকেন্দ্র ছিল রাজশাহী টাউনের উপকণ্ঠ সপুরা গ্রাম। যে রাজশাহীতে আজ ‘নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহলেহাদীছ কনফারেন্স’ অধিবেশন হইতেছে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই স্থান হইতে মাওলানা বেলায়েত আলী ছাহেবকে দুইবার ১৪৪ ধারার সাহায্যে বহিস্কৃত করা হইয়াছিল। আল্লামাতুল হিন্দ শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক দেহলভীর অন্যতম ছাত্র মাওলানা মুহাম্মাদ আনছারী গাযী সাহরাণপুরী আনুমানিক ১১২০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩১০ হিজরীতে মক্কায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনি শৈশবে আমীর সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর হস্তে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সৈয়দ ছাহেবের শাহাদতের পর মাওলানা শাহ ইসহাক ছাহেবের প্রচেষ্টায় তদীয় জামাতা মাওলানা নাছিরুদ্দীন দেহলী ছাহেবের নেতৃত্বে মুজাহেদীনের এক বিরাট বাহিনী সংগঠিত হয় এবং তাঁহারা সৈয়দ ছহেবের পুরাতন কর্মক্ষেত্র ইয়াগিস্তানের ইলাকার পরিবর্তে সিন্ধুর সীমান্তকে জিহাদের কেন্দ্র স্বরূপ নির্বাচিত করেন। মাওলানা নাছিরুদ্দীন ছাহেব শিখদের সহিত কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অবশেষ শাহাদত প্রাপ্ত হন। মাওলানা নাছিরুদ্দীন শহীদের সক্রিয় জিহাদ আন্দোলনের সহিত মাওলানা বেলায়েত আলী ছাহেবের কর্মতৎপরতা ও আন্দোলনের যোগাযোগের কোন সূত্র আমি অবগত হইতে পারি নাই। কিন্তু মাওলানা নাছিরুদ্দীন এবং তাঁহার প্রচেষ্টার কথা মাওলানা বেলায়েত আলী ছাহেবের দলভুক্ত লেখকগণ যে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহা তাঁহদের বহি পুস্তক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। মাওলানা নাছিরুদ্দীন ছহেবের শাহাদতের পরে পরেই শাহ ইসহাক ছাহেব দিল্লী ছাড়িয়া মক্কায় হিজরত করিয়া চলিয়া যান। মাওলানা মুহাম্মাদ আনছারী সিন্ধুর সীমান্তে মাওলানা নাছিরুদ্দীন শহীদের সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ২৪ পরগণার হাকিমপুর যেরূপ মাওলানা বেলায়েত আলী ছাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গাযী ইনায়েত আলী ছাহেবের কর্মকেন্দ্র ছিল, তদ্রূপ মাওলানা মুহাম্মাদ ও হাকিমপুরকে **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর প্রচার কেন্দ্ররূপে নির্বাচিত করিয়াছিলেন এবং তথায় বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে কলিকাতা, ২৪ পরগণা, যশোর, খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুর ও দিনাজপুরের অনেক স্থানে তাহার প্রচারের ফলে **আহলেহদাদীছ আন্দোলন** দানা বাঁধিয়া উঠে এবং তাওহীদ ও সুন্নাতের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়।

শাহ ইসহাক ছাহেবের আর একজন ছাত্র ছিলেন ইলাহাবাদের অন্তর্গত মউ আয়েমার অধিবাসী মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ছাহেব। তিনি ব্যবহারিক সুন্নাতের জাগ্রত প্রতীক ছিলেন। তিনিও বাংলায় **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর প্রচারকরূপে আগমন করেন। কিন্তু আন্দোলনের সক্রিয় রাজনৈতিক অংশের সহিত তাঁহার কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না বলিয়া মনে হয় না। রাজশাহী যেলার জামিরা গ্রাম তাহার প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। মাওলানা যিল্লুর রহীম মঙ্গলকোটীর অন্যতম শিষ্য মাওলানা কারামাতুল্লাহ ছাহেব তাঁহার প্রধানতম অনুচর ছিলেন। রাজশাহী, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের অনেক স্থানে তিনি ব্যবহারিক সুন্নাতের আদর্শকে ভিত্তি করিয়া স্বতন্ত্র জামা'আত গঠন করিয়াছিলেন। ন্যূনধিক ১৩শত হিজরীর পর তিনি মুর্শিদাবাদের বিলবাড়িয়া নামক গ্রামে পরলোক গমন করেন।

কিন্তু **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর ইল্‌মী তাবলীগ ও ব্যাপক প্রচারকার্য একজন ভাগ্যবান পুরুষসিংহ কর্তৃক যেভাবে হিন্দ ও বাংলায় সাধিত হইয়াছিল, অন্য কাহারো দ্বারা তাহার শতাংশও সম্ভবপর হয় নাই। কুতুবুল ইসলাম মাওলানা বেলায়েত আলী যেরূপ আন্দোলনের সক্রিয় রাজনৈতিক অংশের নেতা ছিলেন, শায়খুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মাদ নযীর হুসাইন দেহলভীও সেইরূপ **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর ইল্‌মী তাবলীগের ইমাম ছিলেন। আমীর সৈয়দ আহমাদের আরব জিহাদের আন্দোলনকে মাওলানা বেলায়েত আলী যেরূপ পুনরায় জাগ্রত ও নতুন বলে বলিয়ান করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেইরূপ আল্লামা ইসমাঈল শহীদও তাঁহার পূর্বপুরুষগণ **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর যে ইল্‌মী আমানত রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা বহন করার ভার শায়খুল ইসলাম সৈয়দ নযীর হুসাইন স্বীয় কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। দিল্লীতে শাহ ইসহাক দেহলভীর পরিত্যক্ত মসনদে-ইলমে উপবেশন করিয়া কুরআন ও হাদীছের যে অমৃতসুধা তিনি প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহার জীবন স্রোত হিন্দ বাংলার প্রতি প্রান্তকে সঞ্জীবিত করিয়া সুদূর তিব্বত হইতে নাজদ, হিজায ও ইয়ামানের কত তকলীদ-উষর মরু কান্তার ও নিরস পার্বত্যভূমিকে যে সরস ও শস্য-শ্যামলা করিয়া তুলিয়াছিল, কে তাহার ইয়াত্তা করিবে? সৈয়দ মুহাম্মাদ নযীর হুসাইন ছাহেবের শিক্ষাগার হইতে বাহির হইয়া সহস্র সহস্র উলামা **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর বিজয় পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া হিন্দ ও বাংলার দিকে দিকে কুরআন-হদীছের বর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ, প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা ও সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুরাগের ফলে হিন্দ ও বাংলার পল্লী জীবনেও আহলেহাদীছ আক্বীদা এবং কুরআন ও হাদীছের ব্যবহারিক নির্দেশাবলীর প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। পক্ষান্তরে ঠিক এই সময়ে শাহ আবদুল আযীয ছাহেবের অন্যতম ছাত্র এবং আমীর সৈয়দ আহমাদ ছাহেবের খলীফা মওলানা সৈয়দ আওলাদ হুসাইন কেন্নোজীর যশস্বী পুত্র ভূপালের স্বনামধন্য নাওয়াব আল্লামা সিদ্দীক হুসাইন ছাহেব কুরআন ও সুন্নাতের সাহিত্যিক প্রচার এবং **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর প্রসারকল্পে তাঁহার ধনভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দেন, হাদীছ ও তাফসীরের দুর্মূল্য ও দুস্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহ সুদূর হেজায ও ইয়ামান হইতে সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত ও অনূদিত হইতে থাকে এবং নাম মাত্র মূল্যে দেশের সর্বত্র বিতরিত হয়।

[দ্রষ্টব্য : আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী প্রণীত ‘আহলেহাদীছ পরিচিতি’ গ্রন্থ, পৃঃ ৭১-৮৮]

ভারতীয় আগ্রাসন : বিপর্যস্ত বাংলাদেশ

-মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

ভূমিকা : বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। ১৯৭১ সালে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা, চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। আর স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে সকলে ওয়াকিফহাল। 'দক্ষিণ এশিয়ায় আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী দখলদার শক্তি হিসাবে আবির্ভাব হওয়ার হীন স্বার্থে ভারত মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছে। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ভারত আমাদের সাহায্য করেছিল একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, কিন্তু ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন শক্তিশালী দেশ হিসাবে দেখার লক্ষ্যে নয়, বরং শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান ভেঙ্গে একটি আশ্রিত রাষ্ট্র হিসাবে পাবার লক্ষ্যে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছিল। তার বড় প্রমাণ '৭১-এ ভারত নিজের হাতের মুঠোয় পেয়ে মুজিবনগরের অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে ভারতের সাথে গোপনীয় অসম ৭ দফা চুক্তি করতে বাধ্য করেছিল। এ চুক্তি ৭ দফা চুক্তি নামে খ্যাত।[২০১]

চুক্তির শর্তসমূহ :

দফা-১ : যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে, শুধু তারাই প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকীদের চাকরিচ্যুত করা হবে এবং সেই শূন্য পদ পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।

দফা-২ : বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে (কিন্তু কতদিন অবস্থান করবে তার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি)। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতি বছর এ সম্পর্কে পুনঃ নিরীক্ষণের জন্য দু'দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

দফা-৩ : বাংলাদেশের কোন নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকবে না।

দফা-৪ : অভ্যন্তরীণ আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে।

দফা-৫ : সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব দিবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান, মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নন এবং যুদ্ধকালীন মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে।

দফা-৬ : দু'দেশের বাণিজ্য হবে খোলা বাজার (open merket) ভিত্তিক। তবে বাণিজ্যের পরিমাণ হবে বছর ভিত্তিক এবং যার পাওনা সেটা স্টার্লিংয়ে পরিশোধ করা হবে।

দফা-৭ : বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের প্রশ্নে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং ভারত যতদূর পারে এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সহায়তা দিবে।

অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে উক্ত সাত দফা গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। ফলশ্রুতিতে মুক্তিযুদ্ধ শেষে মিত্রবাহিনী প্রায় ৬০ হাযার কোটি টাকার মালামাল এবং মিল-কারখানার যন্ত্রপাতি লুট করে সদ্য স্বাধীনতা অর্জনকারী শিশু রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু করে পরনির্ভরশীল করার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। ফলে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া বাংলাদেশ সরকার বা মুক্তিযোদ্ধাদের করার কিছুই ছিল না।

কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ধ্বংস করার জন্য শুরু হয় পানি আগ্রাসন। চালু করা হয় 'ফারাক্কা বাঁধ' নামক এক মরণফাঁদ। যার প্রভাবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। শুরু হয়েছে মেরুকরণ প্রক্রিয়া। প্রতিবেশী দেশটির সীমান্ত ঘিরে ১০/১২ কিঃ মিঃ অভ্যন্তরে হাযার হাযার ফেন্সিডিল তৈরীর কারখানা স্থাপিত হয়েছে, যার একমাত্র উদ্দেশ্য বাংলাদেশের কোমলমতি তরুণদের নেশাগ্রস্ত করে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেওয়া। যাতে বাংলাদেশ মেধা ও নেতৃত্বশূন্য হয়ে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে।[২০২]

ইসরাঈলের সাথে ভারতের সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরের পর হতে খুব জোরালো ও অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ উপস্থাপিত হচ্ছে। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে, সন্ত্রাসবাদের অজুহাতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রতিবেশী দেশের (ভারত) সামরিক হস্তক্ষেপ জায়েয করা যেমনটি আফগানিস্তান ও ইরাকে করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, অর্থনৈতিক আগ্রাসন, পানি আগ্রাসন, বোমাবাজি, তথ্য সন্ত্রাস ও নির্বিচারে সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিক হত্যাসহ সর্বগ্রাসী ভারত তার আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে বাংলাদেশে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সুজলা-সুফলা, শষ্য-শ্যামলা ছোট্ট এ দেশটি আজ সত্যিই প্রতিবেশী দেশের গভীর ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ। কেননা আমরা সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের জালে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়েছি, যার অনেকগুলো মরণফাঁদের মধ্যে একটি বোমাবাজি। যার যুগকাষ্ঠে আমরা নিজেরাই বলির পাঠায় পরিণত হচ্ছি। হয়ত সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন কেবল খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের প্রাণপ্রিয় দেশ-জাতি-ধর্মকে অন্যের পাদপাদ্যে অর্ঘ হিসাবে দিতে হতে পারে। ইতিমধ্যে এ সমস্ত কথা দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ভারতের স্বাধীনতা দিবসে আসামে যে বোমা ফাটানো হয় সেটি শাহজালাল মাযার প্রাঙ্গনে বিস্ফোরিত বোমার সাথে মিল রয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, সীমান্তের ওপার হতে বাংলাদেশে বোমা আসছে। প্রতিবেশী দেশের বোমা তো আর পায়ে হেঁটে আসতে পারে না। এর জন্য চাই উপযুক্ত বাহক এবং এদেশীয় এজেন্ট, যারা এই বোমার উপযুক্ত ব্যবহার করবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে তাদের বংশধরদের ক্ষমতায় বসানো *(প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭)*।

উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের প্রাণপ্রিয় এ দেশটিকে সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভরশীল করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, আমাদের দেশের সম্মানিত শাসকবর্গ বারবার এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকারীদের সাথেই হাত মিলিয়ে বেশ উদারতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন কাফির মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে। তিনি বলেন, لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

২০১. ডাঃ ফারুক বিন আব্দুল্লাহ, প্রবন্ধ : ভারতের চানক্য নীতি ও আজকের বাংলাদেশ, মাসিক আত-তাহরীক, ৭ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০০৪, পৃঃ ১৭।

২০২. মেজর জেনারেল (অবঃ) আ. ল. ম ফজলুর রহমান, প্রবন্ধ : 'আমরা কি সিকিমের ভাগ্য থেকে শিক্ষা নেব না' আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা নভেম্বর, ২০০৪, পৃঃ ২৭।

فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ 'মুমিনগণ যেন মুমিনদের ব্যতীত কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকবে না' *(আলে ইমরান ৩/২৮)*।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন :

ইসলামী আন্দোলনের উর্বর এই দেশটিকে সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু করার জন্য ভারত গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। বিশেষ করে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা ভয়ংকাররূপ নিয়েছে ।

সংস্কৃতি মানুষের বাহ্যিক রূপ। মূলতঃ মানুষের ভিতরকার অনুশীলিত কৃষ্টির বাহ্যিক পরিশীলিত রূপকে সংস্কৃতি বলা হয়। সংস্কৃতি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যা মানুষের সার্বিক জীবনাচারকে শামিল করে।[২০৩] সংস্কৃতি একটি জাতির পরিচিতির মৌলিক উপাদান। এর মাধ্যমে কোন জাতির জাতিসত্তা আলাদারূপে পরিস্ফুটিত হয়। কোন জাতির স্বকীয়তা, জাতীয়তা, সামাজিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ তার সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে। তেমনি সংস্কৃতিতে বিজাতীয় আগ্রাসন একটি জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। জাতির উন্নয়নে শিক্ষা আমদানি করা যায় বটে কিন্তু সংস্কৃতি আমদানি করলে জাতিসত্তা হারিয়ে যায়। আজকে স্যাটেলাইটের যুগে কোন জাতিকে পঙ্গু করে দেয়ার জন্য তার অর্থনীতি, রাজনীতি এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের বিলোপ সাধনের জন্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই যথেষ্ট। যা ওপেন সিক্রেট।

সাম্রাজ্যবাদীদের হাত সম্প্রসারণের জন্য আজ আর ব্যবসাকে পুঁজি করার প্রয়োজন পড়ে না। নিজের ঘরে বসে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কালো থাবা বিস্তারই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে স্যাটেলাইট মিডিয়া এ কাজটি অনেক সহজ করে দিয়েছে। তবে যদি নিজেদের সাংস্কৃতিক ভিত মজবুত ও উন্নত হয় এবং নিজেদের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত হয়, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করা খুব কঠিন কাজ নয়। প্রয়োজন শুধু দৃঢ় মানসিকতা আর সংঘবদ্ধ শক্তিমত্তা।

বাংলাদেশ আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীন মাতৃভূমি। আমাদের এ স্বাধীনতা বহু মূল্যে অর্জিত হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে এক রক্তক্ষয়ী ইতিহাস, এক জীবন্ত মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু আজকে এই স্বাধীন দেশটি বিভিন্নমুখী সমস্যা এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসনে জর্জরিত। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বার্থপরতা আমাদের এই স্বাধীন দেশকে করেছে বিপদগ্রস্থ। পরিণত হয়েছে দুর্নীতিগ্রস্ত এক অকার্যকর দেশে। শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা এবং দল ও পরিবার কেন্দ্রিক রাজনৈতিক কর্মসূচীতে দেশ আজ অশান্তিতে সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছে। অন্যদিকে দেশের শান্ত ও কোমল হৃদয়ের মুসলিম মানুষগুলোকে ধর্মীয় প্রতিহিংসার বস্তুতে পরিণত করেছে। বাঙ্গালী মুসলিম জাতিসত্তাকে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত তার মারদাঙ্গা সংস্কৃতি ও তথাকথিত আধুনিক উন্নত সংস্কৃতির বুলি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এক অনাকাঙ্খিত ও অনিবার্য বিপর্যয়ের গহ্বরে নিক্ষেপ করতে সদা তৎপর। অন্যদিকে সর্বগ্রাসী ভারত অদৃশ্যে থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের কলকাঠি নাড়ছে। পাশাপাশি এদেশের মুসলমানদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও আধিপত্য বিস্তার করেছে। এজন্য নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিড়িয়া আগ্রাসনে মধ্যপ্রাচ্যে যেমন ইসরাঈল, সমগ্র বিশ্বজুড়ে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তেমনি দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত।[২০৪]

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় আধিপত্য সহনীয়, গ্রহণযোগ্য এমনকি প্রশংসনীয় করতে অসংখ্য পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের দেশটিকে কবযায় রাখতে গিয়ে এককালে নিজেদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করেছিল বৃটিশরা। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বাজার দখল। আর ভারতও সামান্য কিছু অর্থ ব্যয় করে ঐ একই উদ্দেশ্য সাধন করছে। বৃটিশের সামনে সমস্যা ছিল তারা অধিকহারে আত্মবিকৃত দালাল পায়নি। ফলে হাজী শরীয়তুল্লাহ, তিতুমীর, দুদুমিয়াদের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদেরকেও রক্ত ঢেলে লড়তে হয়েছে। অথচ ভারতের সৌভাগ্য হল তাদের হয়ে আজ এদেশের অনেকেই মীরজাফরী করছে। আত্মবিকৃতি করছে বিজাতীয় দোসরদের কাছে। যার মৌলিক কারণ তাদের চালু করা প্রবল মারদাঙ্গা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশী হয়েও তারা আজ ভারতীয়দের চেয়েও বেশী ভারতীয়। নষ্টা লেখিকা তসলিমা নাসরিন হল তার জাজ্বল্য প্রমাণ। সে যা লিখেছে তা খুব কম সংখ্যক ভারতীয় লেখার সাহস করেছে। এজন্য সে বাংলাদেশ থেকে তাড়িত হলেও ভারতে ঠিকই পুরস্কৃত হয়েছে।

সুধী পাঠক! আধুনিক সংস্কৃতির (Modern culture) নামে তথাকথিত ভারতীয় হিন্দি-বাংলা চলচ্চিত্রের কারণে গণধর্ষণ, হত্যা-রাহাজানী, গুম ইত্যাদি বেড়েই চলেছে। ভারতীয় হিন্দি-বাংলা-তেলেগু-মালয়ালম ইত্যাদি চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে ভারতীয় লেখক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় তার 'চলচ্চিত্রে অপসংস্কৃতি' নামক নিবন্ধে চলচ্চিত্রের কুপ্রভাব তুলে ধরেছেন এভাবে :

১. যৌনতা, যা সর্বকালে সর্বদেশে মানুষের চেতনাকে ভোতা করার মহৌষধ।

২. অর্থ-সম্পদের প্রতি, আরামের রঙ্গিন জীবনের প্রতি ও লাস্যময়ী নারীর প্রতি তীব্র লোভের উদ্রেক।

৩. উৎকট এক বিজাতীয় সংস্কৃতিকে দেশীয় সংস্কৃতির জায়গায় চালানোর চেষ্টা।

৪. নারী যৌবনের ভোগ্যবস্তু। পরে সেবিকা মাত্র।[২০৫]

ড. রশ্মি তার একটি সার্ভে দ্বারা দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় চলচ্চিত্রে শতকরা ৮২ ভাগ ছবিতে নারী-পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট জীব, ১৭ ভাগ ছবিতে সমকক্ষ ও মাত্র একভাগ ছবিতে নারীর স্থান উঁচুতে।[২০৬]

বলা বাহুল্য, আজকে বাংলাদেশের উদ্ভট কাহিনীর মারদাঙ্গা ছবি, স্বল্প পোশাকের নায়িকা নির্ভর নগ্ন ও অর্ধনগ্ন স্টাইল এবং যাবতীয় অশ্লীলতায় ভরপুর যেসব ছবি নির্মিত হচ্ছে তা অনেকাংশে ভারতীয় চলচ্চিত্র দ্বারা প্রভাবিত। বাংলাদেশ তাদের অনেক চলচ্চিত্রের অনুকরণ করে থাকে। শুধু তাই নয় বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে টিভি সিরিয়াল নির্মিত হচ্ছে ভারতীয় টিভি সিরিয়ালের আদলে। একটা সময় ছিল, যখন সংস্কৃতির নোংরা দৃশ্য দেখে নাক ছিটকাতেন সমাজের

২০৩. ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, জীবন দর্শন, পৃঃ ২৭।

২০৪. নূরজাহান বিনতে আব্দুল মজিদ : মিড়িয়া আগ্রাসনের কবলে ইসলাম ও মুসলিম,-মাসিক আত-তাহরীক-১৪তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ডিসেম্বর ২০১০ পৃঃ ৩৮।

২০৫. মাসউদ আহমাদ, আধুনিক সংস্কৃতি : একটি সমীক্ষা মাসিক মদীনা-ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৩,পৃঃ ১৯ ।

২০৬. প্রাগুক্ত ।

ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পিতা-মাতারা। নিজ সন্তানদেরকে তার করাল আগ্রাসন থেকে নিরাপদে রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতেন। কিন্তু এখন কষ্ট করে আর প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে ছবি দেখতে হয় না। প্রত্যেক ঘরে ঘরেই এখন রীতিমত প্রেক্ষাগৃহ তৈরী হয়েছে। যা সত্যিই সেলুকাস বৈকি।

টেলিভিশন একটি শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। এটি বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে কাজে লাগিয়ে একটি জাতির ধ্যান-ধারণা, চিন্তা চেতনা ও উন্নত চরিত্র সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ পীস টিভি (Peace TV)। এই চ্যানেল বিশ্বময় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ডা. যাকির নায়েক কর্তৃক পরিচালিত পীস টিভির (Peace TV) মাধ্যমে মানুষ জানতে পারছে সঠিক ইসলামকে। বর্তমানে এ চ্যানেল অমুসলিমদের কাছেও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, ইসলাম ধর্মসহ বিভিন্ন ধর্মে অনুপ্রবিষ্ট বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা, ইযম-মতবাদ, তরীকা, শিরক-বিদ'আত ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এক ভয়ংকর মারণাস্ত্র এই পীস টিভি (Peace TV)। প্রশ্ন হল, আমাদের দেশের টিভি চ্যানেলগুলো কি জাতির কল্যাণে সঠিক ভূমিকা পালন করছে? অশ্লীল নাটক, সিনেমা, বিজ্ঞাপন, বিজাতীয় অনুষ্ঠান ও মাঝে মাঝে ইসলাম ধর্মের নামে বিভিন্ন মাযহাব-তরীকা, ইযম-মতবাদ ও শিরক-বিদ'আতে পরিপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রচার করছে। এতে করে জাতির মনন-চিন্তা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। পাশাপাশি মানুষ ধর্মীয়ভাবে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে ভারতীয় বিভিন্ন টিভি চ্যানেল। চরম আশঙ্কার খবর এই যে, স্বয়ং বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে ভারতীয় অসংখ্য চ্যানেল দেখানো শুরু হয়েছে। আর এতে করে বছরে হাযার হাযার কোটি টাকা ব্যয় করছে বাংলাদেশ সরকার। টিভি ক্যাবল ব্যবসায়ীদের এক জরীপে বলা হয়েছে, বর্তমান দেশে ২৭২ টির মতো টিভি চ্যানেল রয়েছে। এর মধ্যে ৪০ টির মতো টিভি চ্যানেল এদেশীয় সরকার জনগণের টাকায় কিনে নেয়, যার সবগুলোই ভারতীয় (!)। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের চ্যানেল এইচ বিও (HBO) এখন ভারত থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় বলে পেমেন্টটাও সেখানে করতে হয়।[২০৭]

অথচ বাংলাদেশে আজো অনেক মানুষ রয়েছে, যারা ক্ষুধার তাড়নায় নিজের ঔরসজাত সন্তানকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়, দারিদ্রের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে সূদী ব্যাংক ও এন.জিও-এর নিকটে ধরণা দেয়। যে দেশের মানুষ স্থায়ী বাসস্থানের অভাবে রেললাইনের ধারে, রাস্তার পাশে, এমনকি গাছ তলায় পর্যন্ত রাত কাটায় না খেয়ে। অথচ সে দেশের সরকার বছরে হাযার হাযার কোটি টাকা ব্যয় করছে শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের খোরক পুরণে। এ খবর চরম আশঙ্কা ও দুঃখজনক বৈকি!

তাই বলা যায়, ভারতীয় চ্যানেলগুলোর প্রভাবে হিন্দি আগ্রাসনে বিপর্যস্ত দেশজ সংস্কৃতি। ভারতীয় সংস্কৃতির চলমান আগ্রাসন নতুন প্রজন্মকে নিজস্ব সংস্কৃতি বলয় থেকে দূরে নিক্ষেপ করছে। সামাজিক যোগাযোগের জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ফেসবুকে (Facebook) পাঁচ হাযারেরও বেশী তরুণ-তরুণীর প্রোফাইল দেখে জানা গেছে, যে দেশের জনগণ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভের জন্য রক্ত দিয়েছে, জীবন দিয়েছে, সে দেশের নতুন প্রজন্মের নিকট প্রিয় সিনেমার তালিকায় হিন্দি সিনেমার আধিপত্য। ভারতীয় রাজনৈতিক ও কলাম লেখক 'শশী থারু' তার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'বলিউড হল সফ্‌ট পাওয়ার। এ পাওয়ার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মত কামানের গোলা বর্ষণ করে না ঠিকই, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের রুমে যে বাক্সটি (TV) রয়েছে তার ভিতর দিয়ে সংস্কৃতির গোলা বর্ষণ করে। আর সে গুলো বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তছনছ করে দেয়।[২০৮]

সম্মানিত পাঠক! উক্ত ভারতীয় রাজনৈতিক নেতার বক্তব্যের মধ্য দিয়েই ভারতের নগ্ন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের স্বরূপ স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। সংস্কৃতির আগ্রাসনের রূপ তুলে ধরে মারাঠি রাজনৈতিক নেতা 'শঙ্কর রাও দেও' ভারতের লোকসভায় বলেছিলেন, 'নেহেরু শুধু সংস্কৃতির কথা বলেন। কিন্তু ব্যাখ্যা দেন না। সংস্কৃতি বলতে তিনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন। আজ বুঝলাম, সংস্কৃতি মানে হলো বহুর উপর স্বল্পের আধিপত্য। ভারতে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার পর তিনি এ বক্তব্য রেখেছিলেন'।[২০৯] বাংলাদেশের কোন টিভি চ্যানেল ভারতে দেখানো হয় না। এর জন্য বাংলাদেশের বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। অথচ বাংলাদেশ সরকার তাদের সব চ্যানেলগুলো কিনে দেখায়। সাথে সাথে ভারতীয় বিজ্ঞাপনও প্রদর্শিত হচ্ছে। ফলে এদেশে তাদের একটি বড় ব্যবসায়িক বাজার তৈরী হয়েছে। এ থেকে বাংলাদেশ সরকার বা জনগণ কোনভাবেই লাভবান হচ্ছে না। তাহলে একটি স্বল্পন্নোত দেশ হয়ে আমাদের বিজ্ঞ (?) সরকার বছরে হাযার কোটি টাকা ব্যয় করে তাদের সব চ্যানেল দেখাবে কেন? হায়রে দলীয় সরকার! হায়রে গণতন্ত্র!

সুধী পাঠক! আধুনিক সংস্কৃতির (Modern cultue) নামে আমরা কি ক্রমশঃ বিজাতীয় সংস্কৃতি ও হীন রাজনৈতিক অশুভ দুরভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ছি না? আমরা কি ক্রমশঃ মুসলিম সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আচার-আনুষ্ঠান নিঃশেষ করে ফেলছি না? বর্ষবরণ, মঙ্গলপ্রদীপ, মঙ্গলঘট, কপালে টিপ, শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ, কবরে ফুল দিয়ে সম্মান প্রদর্শন, কিছুক্ষণ নিরবতা পালন ইত্যাদি হিন্দু সংস্কৃতিকে নিজেদের সংস্কৃতি মনে করে নিজস্ব স্বকীয়তা ও নিজস্ব সংস্কৃতি বিলীন করছি না? বাংলাদেশী মুসলমানদের কি নিজস্ব কোন সংস্কৃতি বা স্বাতন্ত্র্যবোধ নেই? অবশ্যই আছে। পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ সুন্নাহ তার জাজ্বল্য উদাহরণ। অমুসলিম বিদ্বানদের মুখেও মুসলমানদের সুস্থ সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা যায়। এ সমন্ধে একজন হিন্দু ব্যক্তি 'শ্রী গোপাল হাওলাদার' মন্তব্য করেন, 'ভারতীয় সংস্কৃতি মুসলমানদের বিবেককে আত্মসাৎ করিতে পারিল না, তাহার কারণ মুসলমান ধর্ম সেই প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিল। ইসলামের একেশ্বরবাদ তত্ত্বের বেশী পরওয়া করে না। কোন বিচার বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা সহ্য করে না। ইসলাম সেমেটিক গোষ্ঠীর ধর্ম। তাহার হিসাবপত্রও সেই গোষ্ঠীর মতোই একেবারে পরিষ্কার। হিন্দু ধর্ম বলিতে পারে 'একমেবাদ্বিতীয়' 'সর্বথলিদ্বংব্রক্ষ'। আর ইহার পরে ব্যাখ্যা দ্বারা শুধু দ্বিতীয় কেন পাথর, পশু, মানুষ, যে কোন জিনিসকেই দৈব্যশক্তির আধার বলিয়া পূঁজা করিতে হিন্দুদের বাঁধে না। ইসলামে এই রূপ তত্ত্ব কথার ও গোঁজামিলের স্থান নেই'।[২১০] বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ 'অন্নদা শঙ্কর রায়' হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতির রূপায়ন এবং জাতিগত সত্ত্বা বিকাশের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'হিন্দুর বিকাশ হবে হিন্দুত্বের ভিতর দিয়ে, আর বাঙ্গালির বিকাশ হবে বাঙালিত্বের ভেতর দিয়ে। বেশ তাহলে মুসলমানদের বিকাশ হবে কিসের ভেতর দিয়ে? সে তো হিন্দু নয় সেটা তো সুস্পষ্ট। কিন্তু সেও তো বাঙ্গালি। তার

---

২০৭. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ঢাকা, ১১ অক্টোবর-২০১৩ প্রথম পৃঃ।

২০৮. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ঢাকা, ২১ অক্টোবর-২০১৩ প্রথম পৃঃ-২ কলাম-২।

২০৯. প্রাগুক্ত।

২১০. মাসঊদ আহমাদ- আধুনিক সংস্কৃতি ঃ একটি সমীক্ষা মাসিক মদীনা, ডিসেম্বর ২০০৩, পৃ:১১।

(মুসলমানের) বাঙালিত্ব কি একটু স্বতন্ত্র নয়? অবিকল হিন্দু ধাঁচের? বাঙালি সংস্কৃতির নামে হিন্দু সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে গেলে একজন মুসলমান তো প্রতিবাদ করবেই। সে তো বলবেই আমরা বাঙালি নই, আমরা মুসলমান। কথাটা আমি যেমন মুসলমানের মুখে শুনেছি তেমনি হিন্দুর মুখেও শুনেছি। ওরা মুসলমান আমরা বাঙ্গালি। এটা তো আমাদেরই স্বখাত সলিল। ইংরেজদের কাটা খাল নয়। খালটা বাড়তে বাড়তে পদ্মা নদীর চেয়েও প্রশস্ত ও গভীর হয়েছে।[২১১] আজ বাংলাদেশের জল, স্থল, অন্তরীক্ষ ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির আগ্রাসনের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চুপ বসে থেকে এবং পড়শী সংস্কৃতির প্রভুত্ব মাথায় তুলে নিয়ে আত্মনিমগ্ন থেকে আমরা শুধু আমাদের দেশ ও জাতির অস্তিত্ব-কেই হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছি না, ধর্মকেও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছি।[২১২]

ইদানিং বাঙালি সংস্কৃতির নামে যে সংস্কৃতির কথা বলা হচ্ছে, তা আসলে এদেশের মাটি ও মানুষের সংস্কৃতি নয়, এদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি নয়। এটি মঙ্গলপ্রদীপ মার্কা সংস্কৃতি। ভাষার প্রেক্ষিতে বাঙালি আমাদের একটি অন্যতম পরিচয়। বাংলাদেশী অস্তিত্বে বাঙালি মুসলমান আছে, বাঙালি হিন্দু আছে, বাঙালি বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান আছে। আরো আছে বিভিন্ন উপজাতি। কিন্তু বাঙালির নামে আমাদের সকল পরিচয় মুছে দেয়ার প্রবণতা একটি ভয়ংকর অপতৎপরতা।[২১৩] বাঙালি সংস্কৃতির অপতৎপরতায় আজ বাংলাদেশী মুসলমানদের নিজস্ব সংস্কৃতি বিলীন হওয়ার পথে। বর্তমানে বাংলাদেশের কিছু মানুষ বুদ্ধিজীবী (!) হবার কারণে অন্য সকলকে ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠান দিয়ে একথা বুঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, ১লা বৈশাখ বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতি হতে পারে। কিন্তু ১লা বৈশাখসহ বাংলা বর্ষটি হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য তাদের সংস্কৃতি। কিন্তু মুসলমানদের জন্য তা আসলে কোন সংস্কৃতি হতে পারে না বরং তাতে বড় ধরণের শিরক আছে।[২১৪] তেমনিভাবে জাতীয় পতাকা জাতীয় গৌরবের নির্দশন, তাকে উন্নত রাখাই হচ্ছে তার মর্যাদা। পতাকার উল্লিখিত সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে ছাহাবীগণ (রাঃ) ও তাবেঈগণ অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু জাতীয় পতাকাকে কোন ক্রমেই অবনমিত হতে দেননি। কিন্তু তাই বলে তাঁরা কেউ পতাকার সম্মানার্থে দাঁড়াতেন না। কিংবা তাকে অভিবাদন করতেন না। প্রতীকের জন্য দাঁড়ানো আর তাকে সালাম করা জড়পূজকদের সংস্কৃতি হতে পারে কিন্তু ইসলামী আদর্শের ঘোর পরিপন্থী।[২১৫] এসব বাঙালি সংস্কৃতি বা আধুনিক সংস্কৃতির আড়ালে হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতির সাথে মুসলমানদের সংস্কৃতি বা জীবনাচরণ একই স্রোতে ধাবমান কোন বিষয় নয়। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের তীব্র আকাঙ্খাই সংস্কৃতির একমাত্র কার্যকর নিয়ন্ত্রক শক্তি। এই নিয়ন্ত্রক শক্তির অনুপস্থিতি মানুষকে এমন সব কর্মকাণ্ডে উদ্ভাবন ও অনুশীলনে প্ররোচিত করে সেগুলোকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সংস্কৃতি বলে প্রচার করা হলেও আসলে সেগুলো সংস্কৃতি নয় বরং অপসংস্কৃতি।[২১৬] এসব অপসংস্কৃতির নামে সংস্কৃতি পালন ইসলাম ধর্মে জঘন্য অন্যায়। মুসলমানদের এই বিজাতীয় অনুরাগ এটা তাদের চরম অধঃপতনের লক্ষণ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের নগ্ন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে বাংলার মুসলিম সমাজ আজ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অথচ মুসলমানদের রয়েছে এক উন্নত ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতি। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরই অবিসংবাদিত নেতা। ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী তা নিম্নের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়,

‘যিনি এসেছিলেন দক্ষিণ আরবের মক্কা নগরীতে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে। সময়টা ছিল অন্ধকার যুগ। মক্কা ছিল পৃথিবীর পশ্চাৎপদ অঞ্চলের অন্যতম। ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে শিল্পকলা ও সুকমারবৃত্তির সাথে তেমন কোন যোগাযোগ ছিল না এ অঞ্চলের মানুষের। মানুষগুলো ছিল উচ্ছৃংখল, ব্যভিচারী, নীতিভ্রষ্ট, নীতিহীনতা, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষই ছিল তাদের নিত্য দিনের সঙ্গী। এমনি এক পাশবিক পরিবেশে আল্লাহ তা‘আলা পাঠালেন পৃথিবীর সর্বশেষ সংস্কারক, নবীগণের শ্রেষ্ঠ নবী, মানুষের শ্রেষ্ঠ মানুষ, মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ ও মূর্তপ্রতীক মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে। যিনি মানুষের বিবেকের মালিন্য দূর করলেন আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকার গ্যারান্টি দিয়ে রেখে গেলেন অমূল্য সংস্কারক গ্রন্থ আল-কুরআন।[২১৭] তাই আজ সময় এসেছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে মুসলমানদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধারণ করা এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও মিডিয়াকে ব্যবহার করা। স্যাটেলাইটের এ যুগে মিডিয়ার প্রচারণাকে মিডিয়া দিয়েই প্রতিহত করতে হবে। এই কৌশল আজ মুসলমানদেরকে আয়ত্ব করতেই হবে। পাশ্চাত্যের সুপ্রসিদ্ধ ধর্মবিষয়ক পণ্ডিত ‘Muhammad (sm) the biography of a prophet'-এর নন্দিত রচয়িতা ‘কারেন আর্মস্টং’ বলেন, একুশ শতকে মুসলমানরা এ রকম একটা স্টাটেজি ছাড়া পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত মিড়িয়ার যুদ্ধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। মুসলমানদের মিডিয়াকে ব্যবহার করা উচিত ইহুদীদের মত। মুসলমানদের লবিং করতে জানতে হবে। মুসলমানদের একটি মুসলিম ‘লবি গ্রুপ’ সৃষ্টি করতে হবে, যাকে ‘সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ’ বলা যেতে পারে। এটা এমন একটা প্রচেষ্টা, এমন একটা সংগ্রাম, যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি মিডিয়াকে পরিবর্তন করতে চান, তাহলে মানুষকে আপনার বোঝাতে হবে যে, ইসলাম রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ শক্তি। মুসলিম উম্মাহকে এই নবতর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার বিকল্প কোন পথ নেই।[২১৮] সংস্কৃতি মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংস্কৃতি ছাড়া জীবন অচল। অধুনা বিশ্বের শিক্ষিতদের অনেকেই মনে করেন মুসলমানদের কোন সংস্কৃতি নেই। আসলে এটা ঠিক নয়। মুসলমানদের সংস্কৃতি প্রতিদিন ভোরে ঘুম ভাঙার পর শুরু হয় এবং শেষ হয় সংস্কৃতির ভিতর দিয়েই।

তাই আসুন! আমরা প্রকৃত সংস্কৃতিবান হই। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় সংস্কৃতির বিভীষিকাময় রাজ্য ছেড়ে মুসলিম সংস্কৃতি পালনে উদ্বুদ্ধ হই। আমাদের জীবন, সমাজ ও দেশ সেই সংস্কৃতির আলোকচ্ছটায় আলোকিত হয়ে উঠুক। ইহকালীন ও পারলৌকিক জীবন হোক সুখময়। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!!

[লেখক : এম.এ. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রংপুর যেলা]

২১১. প্রাগুপ্ত।
২১২. মো ঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার সম্পাদিত, বাংলাদেশ ইনিস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট কর্তৃক প্রকাশিত, আমাদের সংস্কৃতি : বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ , পৃঃ ৬৬।
২১৩. প্রাগুক্ত-পৃ: ৭৬।
২১৪. সিরাজুল ইসলাম তালুকদার, বর্ষ বিভ্রাটে মুসলমান, পৃঃ ১২।
২১৫. মাও ঃ আবু তাহের বর্ধমানী, অধঃপতনের অতল তলে, পৃ: ৪৩।
২১৬. এ, কে, এম নাজির আহমেদ, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি, পৃ: ৪৭।
২১৭. আমাদের সংস্কৃতি : বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ, পৃ: ৫৬।
২১৮. নূরজাহান বিনতে আব্দুল মজীদ: মিডিয়া আগ্রাসনের কবলে ইসলাম ও মুসলিম (মাসিক আত-তাহরীক) ১৪তম বর্ষ ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০১০ পৃ:৪০।

ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তার ইসলাম গ্রহণ : এক নাটকীয় কাহিনী

[ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তা ড. মুহাম্মাদ হুযায়ফা (রাজকুমার) ছিলেন এক কট্টোরপন্থী হিন্দু। তার পরিবার শিক্ষিত হওয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণে ছিল সিদ্ধহস্ত। কোন এক হিন্দু পরিবারের ইসলাম গ্রহণকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ঘটনার পরিপেক্ষিতে তার ইসলাম গ্রহণ। ভারতের ফুলাতের জনৈক এক আলেমের দাওয়াতের মাধ্যমে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তার স্ত্রীও ইসলামকে আলিঙ্গন করেন। নিঃসন্তান রাজকুমার ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে এক পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তান লাভ করেন। শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণের কারণে তিনি চাকুরী থেকে বরখাস্ত হন। যদিও পরবর্তীতে পুনরায় চাকুরীতে যোগদান করেন। ভারতের মুযাফফরনগর থেকে প্রকাশিত মাসিক উর্দূ পত্রিকা 'আরমুগান' ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। তার সাক্ষাৎকার গুরুত্বপূর্ণ মনে করে মূল সাক্ষাৎকার থেকে কিছু সংক্ষেপ করে উপস্থাপন করা হল। সহকারী সম্পাদক]

আহমাদ আওয়াহ : আস-সালাম 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ।

ডক্টর মুহাম্মাদ হুযায়ফা : ওয়া 'আলাইকুমুস সালামু ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ।

আহমাদ আওয়াহ : আল্লাহ্‌র হাযার শুকরিয়া যে, আপনি এসেছেন। আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। আপনার ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমি খুবই উদগ্রীব ছিলাম। আল্লাহ সে সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন।

ডক্টর মুহাম্মাদ হুযায়ফা : দিল্লীতে এক সরকারী কাজে এসেছিলাম। মাওলানা ছাহেবের ফোন তো পাই না। ধারণা করলাম, ফোন করে দেখি। যদি ফুলাতে (ভারতের একটি স্থানের নাম) থাকেন, তাহলে দেখা করে যাব। বহুদিন যাবৎ দেখা সাক্ষাৎ না হওয়ার দরুণ খুবই অস্থির ছিলাম। ফোন করে জানতে পারলাম, তিনি দিল্লীতেই আছেন। আমার জন্য এর চেয়ে খুশির বিষয় আর কী হতে পারে যে, দিল্লীতেই তার সাথে দেখা হয়ে গেল। আমার আল্লাহ্‌র পরম অনুগ্রহ যে, রামাযানের আগেই দেখা হয়ে গেল। কেননা (মানসিক) অস্থিরতাও দূর হয়ে গেল, আবার ঈমানের ব্যাটারীও চার্জ হয়ে গেল। সাথে সাথে একটি প্রোগ্রামেও মাওলানা ছাহেবের সঙ্গে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হ'ল। অনেক সান্ত্বনাও পেলাম। আল-হামদুলিল্লাহ।

আহমাদ আওয়াহ : হুযায়ফা ছাহেব! আমি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছিলাম। আমাদের এই ফুলাত থেকে 'আরমুগান' নামে একটি মাসিক ম্যাগাজিন বের হয়। আপনি সম্ভবত জানেনও। এ জন্য আপনার একটি সাক্ষাৎকার নিতে চাই, যাতে করে যারা দাওয়াতী কাজ করেন তারা এ থেকে অনেক দিক-নির্দেশনা পান। বিশেষ করে আপনার সাক্ষাৎকারের দ্বারা ভয়-ভীতি হ্রাস পায় ও উৎসাহ অনুপ্রেরণা বাড়ে।

ডক্টর মুহাম্মাদ হুযায়ফা : হ্যাঁ, আহমাদ ভাইয়া! আমি 'আরমুগান' সম্পর্কে বেশ জানি। আমি মাওলানা ছাহেবকে কয়েকবার আবেদন জানিয়েছি যে, তিনি যেন উক্ত পত্রিকার হিন্দী সংস্করণ বের করেন। তাহলে প্রতিবছরে কমপক্ষে পাঁচশ' গ্রাহক বানাব ইনশাআল্লাহ! আমি জানলাম যে, সেপ্টেম্বর থেকে হিন্দী সংস্করণ বের হচ্ছে। কিন্তু জানি না কেন সেপ্টেম্বরে তা আর প্রকাশিত হল না।

আহমাদ আওয়াহ : ইনশাআল্লাহ অতি সত্বর তা আসছে। আপনি চিন্তা করবেন না। আব্বুরা এজন্য খুবই চিন্তিত। অথচ পত্রিকার জন্য লোকের দাবী ও চাহিদা খুব বেশী।

ডক্টর মুহাম্মাদ হুযায়ফা : আল্লাহ করুন। খবরটা যেন সত্য হয়। আহমাদ ভাই, এখন আদেশ করুন আমার কাছ থেকে কী জানতে চান?

আহমাদ আওয়াহ : আপনার পরিচয় দিন?

ডক্টর মুহাম্মাদ হুযায়ফা : ১৯৫৭ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখে পূর্ব ইউপির বস্তি যেলার একটি গ্রামে জমিদারগৃহে আমার জন্ম। ১৯৭৭ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাস করি। আমার চাচা ইউপি পুলিশে ডি.এস.পি. ছিলেন। তার ইচ্ছায় পুলিশে ভর্তি হই। চাকুরীরত অবস্থায় ১৯৮২ সালে বি.কম পাস করি এবং ১৯৮৪ সালে এম.এ করি। ইউপির ৫৫টি থানার ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ থাকি। ১৯৯০ সালে আমার প্রমোশন হয় ও সিও হই। ১৯৯৭ সালে একটি ট্রেনিংয়ের জন্য ফ্লোরা একাডেমীতে যেতে হয়। একাডেমির ডাইরেক্টর জনাব এ. এ. ছিদ্দিকী ছিলেন আমার চাচার বন্ধু। তিনি আমাকে ক্রিমিন্যালোজিতে পি.এইচ.ডি. করার পরামর্শ দেন। আমি ছুটি নিয়ে ২০০০ সালে পি.এইচ.ডি. করি। ১৯৯৭ সালে চাকুরীতে সর্বোত্তম দক্ষতা ও কৃতকার্যতার (best performance) ভিত্তিতে আমাকে বিশেষ পদোন্নতি হিসাবে ডি.এস.পি পদে প্রমোশন প্রদান করা হয় এবং মুযাফফরনগর যেলার পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে পোস্টিং দেওয়া হয়। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইঞ্জিনিয়ার। এক বোন আছে, যার বিয়ে হয়েছে এক কলেজ প্রভাষকের সঙ্গে। পরিবারে লেখাপড়া শেখার রেওয়াজ আছে। বর্তমানে আমি পূর্ব ইউপির এক যেলা হেড কোয়ার্টারের গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান।

আহমাদ আওয়াহ : আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলুন?

ডক্টর মুহাম্মাদ হুযায়ফা : আমার পরিবার শিক্ষিত। এ কারণে মুসলমানদের প্রতি শত্রুতায় তারা বিখ্যাত। এর একটি কারণ এটাও যে, আমাদের পরিবারের একটি শাখা আনুমানিক একশত বছর আগে ইসলাম কবুল করে ফতেহপুর, হাঁসওয়াহ ও প্রতাপগড়ে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। তারা ছিল অত্যন্ত পাকা মুসলমান। এদিকে আমাদের বস্তিতে ত্রিশ বছর আগে বস্তির জমিদারদের ছোঁয়াছুঁয়ির জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে আটটি দলিত (অস্পৃশ্য), অচ্ছুত, নিবুংের হিন্দু পরিবার মুসলমান হয়ে যায়। এই দু'টি ঘটনায় আমার পরিবারে মুসলমানদের প্রতি শত্রুতার মনোভাব আরও বৃদ্ধি পায়। আমাদের খান্দানের কিছু যুবক গ্রামে 'বজরং দল'-এর একটি শাখা কায়েম করে। পরিবারের যুবকরাই ছিল এর অধিকাংশ সদস্য। আমি এসব কথা এজন্য বললাম যে, কোন মানুষের ইসলাম গ্রহণের জন্য সবচেয়ে বিরোধী পরিবেশ ছিল আমার। কিন্তু আল্লাহ যাঁর নাম হাদী (হেদায়াতকারী) ও

রহীম (পরম দয়ালু), তিনি আপন শানের কারিশমা দেখাতে চাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে এক অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক পথ প্রদর্শন করেন।

আসলে হয়েছিল কি, গাযিয়াবাদ যেলার পাল খোয়ার্হ একই পরিবারের নয়জন লোক মাওলানার কাছে এসে ফুলাতে মুসলমান হয়। এদের মধ্যে ছিল মা-বাবা, চার মেয়ে ও তিন ছেলে। ছেলে ছিল বিবাহিত। মাওলানা ছাহেব তাদের কালেমা পড়তে বলেন। তারা বলে, আমরা আটজন তো এখন কালেমা পড়ছি। বড় ছেলেটি বিবাহিত। তার স্ত্রী এখনও মুসলমান হতে রাযী নয়। সে রাযী হলেই আমাদের এ ছেলেও একত্রে কলেমা পড়বে। মাওলানা ছাহেব বললেন, জীবন-মরণের আদৌ কোন ভরসা নেই। এও এক সাথেই কালেমা পড়ে নিক। এখনই তা স্ত্রীকে বলার দরকার নেই। এরপর স্ত্রীকে ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করুক। তারপর আবার স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে দ্বিতীয়বারের মত কালেমা পড়বে। মাওলানা ছাহেব তাদের সকলকে কালেমা পড়ান এবং তাদের অনুরোধে সকলের ইসলামী নামও রেখে দেন। তাদের একান্ত অনুরোধে একটি প্যাডে তাদের ইসলাম গ্রহণ এবং নতুন নামের সার্টিফিকেট বানিয়ে দেন। তাদের এটাও বলে দেন যে, আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ যরূরী। এ জন্য শপথনামা তৈরি করে ডিএমকে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠিয়ে দেবে এবং কোন পত্রিকায় ঘোষণা প্রদান যথেষ্ট হবে। এরা খুশি হয়ে সেখান থেকে চলে যায় এবং আইনগত পাকা কার্যক্রম গ্রহণ করে। বাচ্চাদেরকে মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দেয়।

অতঃপর বড় ছেলের বৌ বিষয়টি অবগত হওয়ার পর পরিবারের অন্যান্য লোকদের বলে দেয়। এক দু'জন করে সর্বত্র এ খবর ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এলাকার পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হিন্দু সংগঠনগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠে। টিভি চ্যানেলের লোকেরা এসে যায়। ফলে দেখতে না দেখতেই দাবানলের মত চতুর্দিকে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে। 'দৈনিক জাগরণ' ও 'অমর উজালা' এ দুই হিন্দী পত্রিকায় চার কলামব্যাপী বড় বড় হরফে এই খবর ছাপা হয়। যার হেডলাইন ছিল, *'লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তকরণে সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ : ধর্মান্তকরণ ফুলাত মাদরাসায় হয়েছে'* এই খবরে গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ও উত্তাপ সৃষ্টি হয়। সে সময় আমার পোস্টিং ছিল মুযাফফরনগর। অফিসিয়াল দায়িত্ব ছাড়াও এ খবরে আমার নিজের মধ্যেও ক্রোধের সঞ্চার হয়। আমি আমার দু'জন ইন্সপেক্টরসহ ফুলাত পৌঁছি। সেখানে যেসব লোকের সঙ্গে দেখা হয়, তাঁরা অজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং বলে যে, মাওলানা ছাহেবই কেবল সঠিক বিষয় বলতে পারেন। তারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন যে, আমাদের এখানে কোন বেআইনী কাজ হয় না। মাওলানা ছাহেবের সঙ্গে আপনারা দেখা করুন। তিনি আপনাদেরকে যা সত্য তাই বলবেন। আমি তাদেরকে আমার ফোন নম্বর দিই, যেন মাওলানা ছাহেবের ফুলাত আগমনের খবর আমাকে জানাতে পারে।

তৃতীয় দিন ফুলাতে মাওলানা ছাহেবের প্রোগ্রাম ছিল। ২০০২ সালের ৬ই নভেম্বর বেলা এগারটায় আমরা ফুলাত পৌঁছি। তার সঙ্গে দেখা হয়। তিনি খুব আনন্দের সাথে আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। আমাদের জন্য চা-নাশতার ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন, খুব খুশি হয়েছি যে, আপনারা এসেছেন। আসলে মৌলভী-মোল্লাদের ও মাদরাসাগুলো নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার করা হয়ে থাকে। আমি তো আমার সাথীদের ও মাদরাসাওয়ালাদের বারবার বলি, পুলিশের লোক, হিন্দু সংগঠনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, সি.আই.ডি., সিবিআই-এর লোকদের খুব বেশি বেশি মাদরাসাগুলোতে ডেকে আনা দরকার; বরং কয়েক দিন মেহমান হিসাবে রাখা উচিত, যাতে করে তারা মুসলমানদের ভেতরকার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন এবং মাদরাসাগুলোর কদর বুঝতে পারেন। আমি বললাম, আপনি একদিন আগেও এসেছিলেন। আপনার জন্যই আজ এসেছি। মাওলানা ছাহেব হেসে বললেন, বলুন আপনার কী সেবা করতে পারি?

আহমাদ ভাই! মাওলানা ছাহেব সাক্ষাতের প্রারম্ভেই এমন আস্থা ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটালেন যে, আমার চিন্তা-ভাবনার ধারাই পাল্টে গেল। আমার ভেতর ক্রোধের আধা ভাগও অবশিষ্ট ছিল না। আমি পত্রিকা বের করলাম এবং জানতে চাইলাম, এ খবর পড়েছেন কি?

মাওলানা ছাহেব বললেন, 'রাত্রে আমাকে এ পত্রিকা দেখানো হয়েছে। আমি 'অমর উজালা'-তে এই খবর পড়েছি'। আমি বললাম, 'এরপর এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?'

মাওলানা ছাহেব বললেন যে, 'আমি এক সফরে যাচ্ছিলাম। তো যখন গাড়িতে আরোহণ করতে যাচ্ছি এমন সময় একটি জীপ গাড়ি এসে দাঁড়াল। আমার সফরের তাড়া ছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল, এরা আমাদের ভাই। তারা তাদের বাড়ির লোকজনসহ মুসলমান হতে চায়। এজন্য তারা এক মাস যাবৎ পেরেশান। আমি গাড়ি থেকে নেমে আসি, তাদের কালেমা পড়াই। তাদের চাপাচাপিতে আমি তাদের ইসলামী নামও বলে দিই এবং তাদের সবাইকে ইসলাম গ্রহণের একটি সার্টিফিকেটও দিই। তাদের এটাও বলে দিই যে, আইনগত কার্যক্রম সম্পন্ন হলে আপনারা শপথনামা/হলফনামা তৈরি করে ডি.এম-কে জানাবেন। একটি পত্রিকায় ঘোষণা পাঠাবেন। তবে আরও ভাল হয় যদি যেলা গেজেটে দিয়ে দেন। তারা ওয়াদা করল যে, কালই গিয়ে আমরা এসব কাজ করব।

আমি জানতে পেরেছি, তারা তা সম্পন্ন করেছে। মাওলানা ছাহেব বললেন, আমাদের দেশ সেক্যুলার রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের আইন-কানূন আপন ধর্ম মানা ও ধর্মের দাওয়াত প্রদানের মৌলিক অধিকার আমাদেরকে দিয়েছে। কাউকে ঈমানের দাওয়াত দেয়া, কেউ মুসলমান হতে চাইলে তাকে কালেমা পড়ানো আমাদের মৌলিক আইনগত ও সাংবিধানিক অধিকার। যে অধিকার আইন ও সংবিধান আমাদেরকে দেয়, সে ব্যাপারে আমরা কাউকে ভয় পাই না। আমরা জেনে-বুঝে কোন বেআইনী কাজ কখনো করি না। ভুলক্রমে হয়ে গেলে তার সংশোধন ও ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করি। লোভ দেখিয়ে কিংবা ভীতি প্রদর্শনপূর্বক ধর্ম পরিবর্তনের কথা বলছেন? এটা তো একদম বেআইনী। আমার ব্যক্তিগত ধারণা হল এই যে, এই বেআইনী কাজ সম্ভবও নয়। ধর্ম পরিবর্তন করা অথবা কারোর মুসলমান হওয়া তার অন্তর-মনের বিশ্বাসের পরিবর্তনের ব্যাপার, যা লোভ-লালসা বা ভয়-ভীতির দ্বারা হতেই পারে না। আপনাকে খুশী করার জন্য কেউ বলতে পারে যে, আমি হিন্দু হচ্ছি অথবা মুসলমান হচ্ছি। কিন্তু এত বড় সিদ্ধান্ত নিজের জীবনে মানুষ ভেতরের অনুমোদন ছাড়া কখনো নিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত: এর চাইতেও যা গুরুত্বপূর্ণ ও যরূরী তা হল, আমি একজন মুসলমান। আর মুসলমান তাকে বলা হয়, যে সকল সত্য কথাকে মানে। আমাদের মালিক এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) যাঁর সম্পর্কে এই ভুল ধারণা বিদ্যমান যে, তিনি কেবল মুসলমানদের রাসূল এবং তাদের (মুসলমানদের) জন্য

মালিকের পক্ষ থেকে সংবাদবাহক ছিলেন। অথচ কুরআন ও হাদীছে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে কেবল একথাই পাওয়া যায় যে, তিনি বলেন, আমি সকলের মালিক প্রভুর পক্ষ থেকে প্রেরিত সমগ্র মানব জাতির প্রতি সর্বশেষ রাসূল। তিনি এত সত্যবাদী ছিলেন যে, তাঁর দ্বীনের ও জীবনের শ্রেষ্ঠ দুশমনও তাঁকে কখনো মিথ্যাবাদী বলতে পারেনি। বরং তাঁর শত্রুরাও তাঁকে আছ-ছাদিকুল আমীন (বিশ্বস্ত আমানতদার) এবং সত্যবাদী ও ঈমানদার উপাধি দিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস এই যে, দিন হচ্ছে, আমাদের চোখ তা দেখছে। অথচ এই চোখ ধোঁকা দিতে পারে যে, দিন হচ্ছে। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) আমাদের যে খবর দিয়েছেন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র ভুল, ধোঁকা ও মিথ্যার লেশমাত্র নেই। আমাদের রাসূল (ছাঃ) জানিয়েছেন, 'মানুষ পরস্পর রক্ত সম্পর্কীয় ভাই (আদম (আঃ)-এর দিক দিয়ে)। সম্ভবত আপনারাও তা বিশ্বাস করেন'। আমি বললাম যে, 'আমাদের এখানেও তাই মনে করা হয়'।

মাওলানা বললেন, 'একথা তো একদম সত্য যে, আমরা এবং আপনারা, আমি এবং আপনি রক্ত সম্পর্কীয় ভাই। এর চেয়ে বেশী এটাও হতে পারে যে, আপনি আমার চাচা অথবা আমি আপনার চাচা। আমার ও আপনার মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে। এই রক্ত সম্পর্ক ছাড়াও আপনিও মানুষ আর আমিও মানুষ। আর মানুষ তো সে-ই, যার মধ্যে প্রেম-ভালবাসা বিদ্যমান। একে অন্যের প্রতি কল্যাণের প্রেরণা বিদ্যমান। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে আপনি যদি এটা মনে করেন যে, হিন্দু ধর্মই একমাত্র মুক্তির পথ ও মোক্ষ লাভের উপায়, তাহলে আপনাকে এই সম্পর্কের দিকে তাকিয়ে ও এই সম্পর্কের খাতিরে আমাকে হিন্দু বানাবার জন্য জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করা উচিত। আর আপনি যদি মানুষ হন, আপনার বুকের মধ্যে যদি পাথর না থেকে থাকে, মায়া-মমতাশূন্য না হন, তাহলে আপনার ভেতর ততক্ষণ পর্যন্ত স্বস্তি আসা উচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ভুল পথ ছেড়ে মুক্তির পথে এসে যাই'। অতঃপর মাওলানা ছাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কথা ঠিক কিনা? আমি বললাম, 'বিলকুল ঠিক'।

মাওলানা ছাহেব বললেন, 'আপনাকে সর্বপ্রথম এসেই আমাকে হিন্দু হবার জন্য বলা দরকার ছিল'।

দ্বিতীয় কথা হল, আমি মুসলমান। বহির্গত সূর্যের আলোকরশ্মির চেয়েও আমার এ কথার উপর বেশি বিশ্বাস যে, ইসলামই একমাত্র সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ধর্ম এবং মুক্তি লাভের একমাত্র পথ। আপনি যদি মুসলমান না হয়ে দুনিয়া থেকে চলে যান, তাহলে চিরস্থায়ীভাবে নরকে জ্বলতে হবে। জীবনের একটি নিঃশ্বাসেরও বিশ্বাস নেই। যেই শ্বাসটি ভেতরে চলে গেল এর কী নিশ্চয়তা আছে যে, তা বাইরে আসা পর্যন্ত আপনি বেঁচে থাকবেন? আর এরই বা ভরসা কোথায় যে, যেই নিঃশ্বাসটি বাইরে বেরিয়ে গেল, তা ভেতরে নিয়ে আসা পর্যন্ত আপনি বেঁচে থাকবেন? এমতাবস্থায় আমি যদি মানুষ হই আর আমি আপনাকে আমার রক্ত সম্পর্কীয় ভাই মনে করি, তবে যতক্ষণ আপনি কালেমা পড়ে মুসলমান না হবেন, ততক্ষণ আমার স্বস্তি আসবে না।

তিনি আরো বলেন, একথা আমি নাটক হিসাবে বলছি না। স্বল্পক্ষণের এই সাক্ষাতের পর রক্ত সম্পর্কের কারণে যদি রাত্রে শুতে শুতেও আপনার মৃত্যু ও নরকের আগুনের খেয়াল জাগে, তাহলে আমি অস্থির হয়ে কাঁদতে থাকব। এজন্য স্যার! আপনি পালখোহওয়ালদের চিন্তা বাদ দিন। যেই মালিক জন্ম দিয়েছেন, পয়দা করেছেন, জীবন দিয়েছেন তাঁর সামনে মুখ দেখাতে হবে। আমার ব্যাথার চিকিৎসা তো তখনই হবে, যখন আপনারা তিনজনই মুসলমান হয়ে যাবেন। এজন্য আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি আমার উপর দয়া করুন। আপনারা তিনজনই কালেমা পড়ুন।

আহমাদ ভাই! আমি তখন এক অপর বিস্ময়ের সাগরে নিমজ্জিত ছিলাম। মাওলানা ছাহেবের ভালবাসা তো নয়, তাব সবগুলো কথা ছিল যাদু! আমি এমন এক পরিবারের সদস্য যাদের ঘটিতে মুসলমান, মুসলিম রাজা-বাদশাহ ও ইসলামের প্রতি শত্রুতা পান করানো হয়েছিল। আমি এই খবর পড়ে সীমাতিরিক্ত উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ হই এবং বিষয়টি তদন্ত করে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফুলাত গিয়েছিলাম। কিন্তু মাওলানা ছাহেব আমাকে না ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়নের জন্য বলছেন, আর না ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্য বলছেন। ব্যস, সোজাসুজি মুসলমান হবার জন্য বলছেন। কিন্তু তখন আমার অন্তর ও বিবেক যেন মাওলানা ছাহেবের ভালবাসার নিগড়ে অসহায় রকম বন্দী। আমি বললাম, কথা তো আপনার একেবারে সাদামাটা ও সত্য এবং আমাদেরকে ভাবতেই হবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত এত জলদী করার নয় যে, এত তাড়াতাড়ি আমি তা নিতে পারি। মাওলানা ছাহেব বললেন, সত্য কথা হল আপনি এবং আমি সবাই মালিকের সামনে এক বড় দিনের হিসাবের জন্য একত্রিত হব। সে সময় এই সত্য আপনি অবশ্যই পাবেন যে, এই ফায়ছালা খুব তাড়াতাড়ি করার এবং এতে বিলম্ব করার আদৌ অবকাশ নেই। মানুষ এ ব্যাপারে যত দেরী করবে, ততই পস্তাবে।

জানি না, এরপর জীবন-যিন্দেগী ফায়ছালা করার অবকাশ দেয় কি-না। মৃত্যুর পর পুনরায় আফসোস ও পস্তানো ছাড়া মানুষের আর কিছুই করার থাকবে না। করতে পারবে না। এ কথা অনড় সত্য যে, ঈমান গ্রহণ করা এবং মুসলমান হওয়ার চেয়ে বেশী তাড়াহুড়া করার মত আর কোন ফায়ছালা হতেই পারে না। তবে হ্যাঁ, আপনি যদি হিন্দু ধর্মকে মুক্তির পথ মনে করেন, তাহলে আমাকে হিন্দু বানাতে আপনাকে এতটাই জলদী করা দরকার, যেভাবে আমি মুসলমান হবার জন্য তাড়াতাড়ি করতে বলছি। আমার খেয়াল হল যে, যে বিশ্বাস, যে দৃঢ় আস্থা ও প্রত্যয়ের সঙ্গে মাওলানা ছাহেব আমাকে মুসলমান হতে বলছেন, সে বিশ্বাস ও আস্থার সাথে আমি তাঁকে হিন্দু হতে বলতে পারছি না। বরং সত্য বলতে কি, আমরা আমাদের গোটা ধর্মকে কোথাও শ্রুত প্রথার উপর কাহিনী সমষ্টি ছাড়া কিছুই মনে করি না। হিন্দু ধর্মের উপর আমার বিশ্বাসের অবস্থা যখন এই, তখন কাউকে কোন্ ভরসায় ও কিসের উপর ভর করে হিন্দু হওয়ার জন্য দাবি জানাতে পারি?

আমার ভেতর থেকে কেউ যেন বলছিল, রাজকুমার! ইসলামের মধ্যে অবশ্যই সত্য রয়েছে, মাওলানা ছাহেবের মধ্যে এই সত্যের বিশ্বাস রয়েছে। মাওলানা ছাহেব কখনো কখনো তোষামোদের সাথে আবার কখনো জোর দিয়ে বারবার আমাদেরকে কালেমা পড়ে মুসলমান হবার জন্য বলতে থাকেন। মাওলানা ছাহেব যখন তোষামোদ করতেন, তখন আমার মনে হত যেন কোন বিষপানে ইচ্ছুক ও আগ্রহী অথবা আগুনে লাফ দিয়ে পড়তে উদ্যত কাউকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কোন সংবেদনশীল, কোন মমতাময়ী মা তার সন্তানকে তোষামোদ করছেন।

মাওলানা ছাহেব আমাদেরকে বারবার কালেমা পাঠের উপর জোর দিতে থাকেন। আমি ওয়াদা করি, আমরা বিষয়টা নিয়ে অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করব। আমাদের পড়ার জন্য কিছু বই

দিন। আমরা গবেষণা করে দেখি। তখন তিনি আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করতে বলেন, হে মালিক! তুমি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। তুমিতো সর্বাধিক দয়ালু! চোখ বন্ধ করে যখন সেই মালিককে স্মরণ করবেন, তখন আপনাদের জন্য আল্লাহ ইসলামের পথ অবশ্যই খুলে দেবেন। মূলতঃ মানুষের দিলকে ও হৃদয়-মনকে পাল্টে দেবার ফায়ছালা সেই একক সত্তার কাজ। আমি মাওলানা ছাহেবকে বলি, ঠিক আছে। পরিবেশ গরম হচ্ছে, উত্তপ্ত হচ্ছে। আপনি পত্রিকার এই খবর খণ্ডন করে একটি বিবৃতি দিন। মাওলানা ছাহেব বললেন, আমি তাদেরকে ধর্মীয় ও আইনগত অধিকার ভেবে কালেমা পড়িয়েছি। মিথ্যা খণ্ডন কিভাবে হতে পারে? আমার অভিমত হল, আপনারাও কোন মিথ্যা কথা গোপন করবেন না। আমি বললাম, আচ্ছা আমরা নিজেরাই করে দেব। এরপর আমরা ফিরে যাই।

আহমাদ আওয়াহ : আপনি কালেমা পড়েননি?

ডক্টর মুহাম্মাদ হুযায়ফা : মাওলানা ছাহেব কর্তৃক প্রদত্ত বইসমূহ অধ্যয়ন করে আমার ভেতর মাওলানা ছাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ থেমে থেমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইসলাম সম্পর্কে পড়ার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পায়। আমি মুযাফফরনগরে একটি দোকান থেকে কুরআন মাজীদের একটি হিন্দী অনূদিত কপি নিয়ে আসি। আমি ফোনে মাওলানা ছাহেবের কাছে এটি পড়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করি। তিনি বলেন, দেখুন কুরআন মজীদ আপনি অবশ্যই পড়বেন। কিন্তু হ্যাঁ, কেবল একথা মনে করে যে, আমার মালিকের প্রেরিত বাণী, এটি মালিকের কালাম, মালিকের কথা মনে করে খুব ভালভাবে আপনি পড়ুন। পবিত্র কালাম পাক-সাফ হয়েই পড়া উচিত। অতঃপর আমি দু'সপ্তাহে গোটা কুরআন মাজীদ পড়ে ফেলি। এখন আমার মুসলমান হওয়ার জন্য ভেতরের দরজা খুলে গিয়েছে। আমি ফুলাত গিয়ে মাওলানা ছাহেবের সামনে কালেমা পড়ি। মাওলানা ছাহেব আমার নাম 'রাজকুমার' বদলে আমার ইচ্ছানুক্রমে 'মুহাম্মাদ হুযায়ফা' রাখেন এবং বলেন যে, আমাদের নবী করীম (ছাঃ) এই নামের এক ছাহাবীকে গোপনীয়তা রক্ষা ও গোয়েন্দাগিরীর জন্য পাঠাতেন। এদিক দিয়ে এ নাম আমার খুব ভাল লাগে।

আহমাদ আওয়াহ : ইসলাম গ্রহণের পর চাকুরীতে আপনার কোন সমস্যা হয়নি?

ডক্টর মুহাম্মাদ হুযায়ফা : এলাহাবাদে পোস্টিং থাকাকালে আমি আমার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিই এবং আইনগত কার্যক্রম হাইকোর্টের একজন উকীলের মাধ্যমে গ্রহণ করি, যেজন্য আমাকে আমার বিভাগ থেকে অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক ছিল। আমি এজন্য দরখাস্ত করি। একজন বেদজী ছিলেন আমার বস। তিনি কঠোরভাবে আমাকে এ থেকে বাধা দেন এবং আমি এ সিদ্ধান্ত নিলে তিনি আমাকে সাসপে- করবেন বলে হুমকিও দেন। আমি তাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিই, এ সিদ্ধান্ত তো আমি নিয়ে ফেলেছি। এখন আর সেখান থেকে ফেরার কোন প্রশ্নই আসে না। আপনি যা করতে পারেন করুন। তিনি আমাকে সাসপেন্ড করেন। আমি আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করি। এসময়ে ইসলাম সম্পর্কে আরো জানার সুযোগ পেলাম। পরবর্তীতে লাক্ষ্ণৌয়ের একজন মুসলমান অফিসারের সহযোগিতায় এবং আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়।

আহমাদ আওয়াহ : আপনার সঙ্গী দুই ইন্সপেক্টরের কী হল, যারা আব্বুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?

ডক্টর মুহাম্মাদ হুযায়ফা : তাদের একজন ইসলাম কবুল করেছেন। তার পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক সমস্যা ও বিপদাপদ এসেছে। তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু তিনি দৃঢ় ও স্থির আছেন আপন বিশ্বাসে। আল্লাহ তা'আলা তার অবস্থার সমাধান করেছেন। দ্বিতীয়জন ভেতরে ভেতরে তৈরি। কিন্তু সাথীর অসুবিধা হওয়ার কারণে একটু ভীত।

আহমাদ আওয়াহ : পরিবারের লোকদের ওপর কাজ করেননি?

ডক্টর মুহাম্মাদ হুযায়ফা : আল-হামদুলিল্লাহ, কাজ চলছে। ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে চলছে। তবে এলাহাবাদে পোস্টিংকালে আমি আমার স্ত্রীকে অনেক কিছু বলে দিই। সে ছিল খুব অনুগত, সহজ-সরল মহিলা। সে আমার সিদ্ধান্তের এতটুকু বিরোধিতা করেনি, বরং সকল অবস্থায় আমার সাথে থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। আমি তাকেও বই-পুস্তক পড়িয়েছি। আমাদের বিয়ে হয়েছে দশ বছর। কিন্তু কোন সন্তানাদি ছিল না। আমি তাকে লোভ দেখাই যে, ইসলাম কবুল করলে আমাদের মালিক আমাদের উপর খুশি হবেন এবং আমাদের সন্তানাদিও দেবেন। সন্তান না হবার কষ্টে সে খুবই বিষণ্ণ থাকত। এই কথায় সে খুব খুশি হয়। এক মাদরাসায় নিয়ে গিয়ে তাকে কালেমা পড়াই। আল্লাহ্‌র কাছে বহু দো'আ করি, আমার রব! আপনার ভরসায় আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আপনি আমার ভরসার সম্মান রক্ষা করুন এবং একটা হলেও তাকে সন্তান দিন। আল্লাহ্‌র কি দয়া! এগার বছর পর আমাদেরকে তিনি ফুটফুটে পুত্রসন্তান দেন। এরপর তিন বছর যেতেই এক কন্যা সন্তান দান করেছেন। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।

আহমাদ আওয়াহ : পাঠকদের উদ্দেশ্যে আপনি কোন পয়গাম বা নছীহত করবেন কি?

ডক্টর মুহাম্মাদ হুযায়ফা : ইসলাম ধর্ম থেকে বড় কোন সত্য নেই। আর এ এমন এক সত্য যে, একে যিনি মেনে চলবেন, তাকে এর উপর আমল করতে কাউকে ভয় পাবার দরকার নেই, কিংবা অন্যের কাছে পৌঁছতে বাধা সৃষ্টি করারও দরকার নেই। কম-বেশী বিরোধিতা আসবে। আমাদের মাওলানা ছাহেব বলেন, 'ইসলাম এক আলো আর সমস্ত বাতিল ধর্ম অন্ধকার। অন্ধকার কখনো আলোর উপর জয়লাভ করতে পারে না। বরং আলোই জয়ী হয়। আলো যখন কখনো কখনো হ্রাস পায়, তখন মনে হয় অন্ধকার চতুর্দিকে ছেয়ে গেছে এবং সবকিছু ঢেকে ফেলেছে। কিন্তু আলো একটু উজ্জ্বল করে তুলে ধরুন, দেখবেন অন্ধকার দূরে পালিয়ে গেছে'। ব্যস, আমাকে এটা মানতে হবে। আর এটাই আমার পয়গাম বা নছীহত যে, বিজয় সবসময় আলোর মশালধারীদেরই হয়। এজন্য কোনরূপ ভয়-ভীতি ব্যতিরেকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া দরকার এবং কোন রকম লোভ-লালসা ছাড়াই সত্যিকারের পারস্পরিক ব্যথা-বেদনার হক আদায় করার নিয়তে দাওয়াত দিয়ে যাই। দেখবেন, আমার মত ইসলামের দুশমন ও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী ব্যক্তি তদন্তের উদ্দেশ্য এসে যদি হেদায়াত পাই, তাহলে সহজ সরল মন-মস্তিষ্কের লোকগুলোর উপর এর প্রভাব পড়া তো আরও স্বাভাবিক।

আহমাদ আওয়াহ : **শুকরিয়া, জাযাকাল্লাহ।**

ডক্টর মুহাম্মাদ হুযায়ফা : আচ্ছা, এজাযত দিন। আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ।

আহমাদ আওয়াহ : **ওয়া 'আলাইকুমুস সালাম ও রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ। অনেক অনেক শুকরিয়া।**

ডক্টর মুহাম্মাদ হুযায়ফা : শুকরিয়া জাযাকুমুল্লাহু খায়রান।

[সাক্ষাৎকার গ্রহণে : আহমাদ আওয়াহ নদভী; মুযাফফরনগর, ভারত থেকে প্রকাশিত মাসিক 'আরমুগান'-এর সৌজন্যে]

প্রচলিত দ্বীন

-মঈনুল হক মঈন

আমি সিলেট শহরের একজন মুদ্রণ ব্যবসায়ী। শিক্ষা জীবনে সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল এবং এম সি কলেজ থেকে বি এ পাশ করি। অতঃপর সিলেট ল' কলেজে দু'বছর অধ্যয়ন করলেও শেষ সনদটি অর্জিত হয়নি। শায়েখ আবু তাহের ও শায়েখ আবুল কালাম মুহাম্মদ আব্দুর রহমান রচিত প্রায় ১৪/১৫টি বই ছাপানোর সুবাদে তাঁদের মাধ্যমেই আহলেহাদীছ আন্দোলন এবং 'আত-তাহরীক'-এর সাথে পরিচিত হই। অতঃপর জীবন চলার পথে বিভিন্ন শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কার দেখতে পাই, যা আমাকে ব্যথিত করে। বাতিল না চিনলে হক্ব চেনা সম্ভব নয়। তাই এ বিষয়ে দু'কলম লিখলাম। আলিম সমাজ শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কার সম্পর্কে আরো জ্ঞাত হবেন এবং তা নির্মূলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে আমি মনে করি।

প্রচলিত দ্বীন

১৯৬৮ সাল থেকে আজ অবধি জীবন যুদ্ধের প্রতি পরতে পরতে দ্বীন ইসলামকে বিকৃত ও অসহায় অবস্থায় দেখতে পেয়েছি। নিম্নে তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হল-

(এক)

জন্মেছিলাম পীর-ফকীর প্রভাবিত সিলেট যেলায়। এলাকার শতকরা ৯৫% মুসলিমই একজন বিশিষ্ট পীরের মুরীদ। অবশ্য সে পীর ছাহেবের কিছু খলীফা বা প্রতিনিধি রয়েছেন বিভিন্ন এলাকা কেন্দ্রিক। শিশুকাল থেকে ফয়েয লাভের জন্য উক্ত পীর ছাহেবকে পালকী করে আমাদের এলাকায় মাঝে-মধ্যে নিয়ে আসতে দেখেছি। গাড়ীতে করে আনলে ফয়েয লাভ করা সম্ভব হবে না, তাই পীর ছাহেবের জন্য বিশেষভাবে তৈরী অনেক লম্বা ডাণ্ডাওয়ালা পালকী আছে। এ ডাণ্ডার সুবিধা হল, এখানে ভাড়াটিয়া কোন বেহারার প্রয়োজন হয় না। বরকতের জন্য পীর ছাহেবের মুরীদানরা উভয় সাইটে দশ+দশ=বিশ জনে হুড়োহুড়ি করে পালাক্রমে বহন করেন। একটু পর পর একজনকে অনেকটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে অন্যজন ফয়েয সংগ্রহ করার জন্য ডাণ্ডায় হাত বা কাঁধ লাগান। মুরীদদের চাহিদা মোতাবেক পীর ছাহেব বিভিন্ন স্থানে যাত্রাবিরতি করেন। পীর ছাহেবের কাছ থেকে ফয়েয নেয়ার জন্য মুরীদানরা হুড়োহুড়ি করে কদমবুসি করেন। কদমবুছি করতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করে অনেকেই আহত হন। বিশেষ করে কম বয়সের এবং বেশী বয়সের মানুষদেরই বেশী সমস্যা হয়ে থাকে। ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে আহত হলেও কারো তেমন কোন অভিযোগ পরিলক্ষিত হয় না। পীর ছাহেবের কদমে একটু হাত লাগাতে পেরে অনেকেই তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলেন। তবে যারা পীর ছাহেবের কদমে হাত দিতে ব্যর্থ হয়েছেন তাদের আফসোসের কোন সীমা থাকে না। পরকালের জন্য কোন অসীলার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা অনেকটা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। কেননা ক্বিয়ামতের ময়দানে পীর ছাহেবরা প্রত্যেকে তাদের মুরীদদের নিয়ে সদলবলে পুলছিরাতের পুল পার হবেন। যারা পীরের স্পর্শ লাভে ধন্য হতে পারেনি, তাদের কপালে রয়েছে নির্ঘাত খারাবি।

পীর ছাহেবের বেশ কয়েকজন মুরীদ ছাহেবের সুপারির খেদমতে নিয়োজিত। বাঁশ দিয়ে তৈরী বিশেষ শলাকা সিলেটি ভাষায় যাকে 'কুটনী' বলা হয়, তার ভিতরে পান সুপারি ঢুকিয়ে মিহি করে পীর ছাহেবকে পরিবেশন করা হয়। সুপারি কিছু সময় মুখে রেখে চিবিয়ে পীর ছাহেব তা মাটিতে ফেলে দেন। অতঃপর পীর ছাহেবের চিবানো কথিত বরকতপূর্ণ (?) এ সব সুপারি খাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এখানে আহত হয়েও একটু সুপারি সংগ্রহ করাটাকে বেশ ভাগ্যের মনে করা হয়। আমার শিশু বয়সে আমি এগুলো দূরে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেছি। নিজের জীবনের জন্য বেশী মায়া থাকায় এমন ধাক্কাধাক্কি করে উক্ত শিরকী বরকত হাছিল করা আমার পক্ষে কখনও সম্ভব হয়নি।

(দুই)

আমাদের স্থানীয় অলংকারী গ্রামের পীর ছাহেব অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারেন বলে এলাকায় জনশ্রুতি আছে। চোরে নিয়ে যাওয়া গরুটি বর্তমানে কোথায় আছে, বিদেশ যাত্রা মঙ্গল নাকি অমঙ্গল হবে, আগামী বন্যায় কী পরিমাণ পানি হতে পারে ইত্যাদি প্রশ্নগুলো জানার জন্য লোকজন তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। পীর ছাহেব দুর্বোধ্য ভাষায় ভবিষ্যৎবাণী করতেন। তার বর্ণনাকৃত দুর্ভোধ্য শব্দগুলো নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। বিয়ের ৬/৭ বছর পরও আমার ছোট চাচীর কোন সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ না করায় তিন চাচী আমাকে সাথে করে অলংকারীর পীর ছাহেবের কাছে নিয়ে যান। আমার তখন বয়স ছিল দশের কাছাকাছি। পীর ছাহেব আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, বড় হয়ে আমি একজন পীর হব। আর চাচীর ব্যাপারে বলেছিলেন যে, চাচীর কপালে সন্তান-সন্ততি নেই। এ কথা শুনে আমার চাচী কান্না শুরু করে দেন। হেঁটে আসার পথে আমার এ চাচী অঝোর নয়নে কাঁদছিলেন। উল্লেখ্য যে, তখন অলংকারী গ্রামে পরিবহনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। বড় দু'চাচী আমার ছোট চাচীকে শান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন যে, সন্তান না হওয়ার বিষয়টি তারা চাচাকে আপাততঃ জানাবেন না। কেননা চাচা মাসখানেক পর তাঁর কর্মস্থল বৃটেনে ফিরে যাবেন। পরবর্তীতে চাচা দেশে আসার পর ঘটনাটা জানাবেন। তারপর তারা চাচার জন্য আরেকজন চাচী আনবেন।

পরবর্তীতে মাসে এয়ারটিকেট কনফার্ম করতে চাচা সাথে করে চাচীকেও শহরে নিয়ে যান। চাচীকে ডাক্তার দেখান। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানান চাচী এখন গর্ভবতী। আমার এ চাচা আজ পরপারে এবং চাচীর রয়েছে প্রায় এক ডজন নাতী-পুতি। আমার এ চাচী আজ (০৭/০১/২০১৪) সিলেটস্থ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ডাক্তার বাইপাস সার্জারীর পরামর্শ দিয়েছেন। অবশ্য বড় দু'চাচী ইতিপূর্বে মারা গেছেন। সম্মানিত পাঠকবৃন্দের কাছে আমার এ চাচীর সুস্থতা ও অন্য দু'চাচীর মাগফেরাতের জন্য দু'আ চাই।

(তিন)

আমার বয়স তখন ছিল এগার। স্থানীয় খালপার গ্রামের হরমুজ আলী নামক মধ্যবয়স্ক এক দিনমজুর। হঠাৎ তিনি নিঁখোজ হয়ে যান। চার দিন অপেক্ষার পর অলংকারীর পীর ছাহেবের কাছে

গেলে তিনি 'কাঁক-শকুন' দেহ খাচ্ছে বলে হা হা করে কাঁদেন। হরমুজ আলীর মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চয়তা পেয়ে পরদিন 'পাঁচা'র জন্য অর্থাৎ পাঁচ দিনের অনুষ্ঠানের জন্য গ্রামে বৈঠক বসে। আমাদের এলাকায় যথেষ্ট হিন্দু লোকজন রয়েছে। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজে কারো মৃত্যু হলে পাঁচা, দশা, চল্লিশার অনুষ্ঠানাদি খুবই গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। বিশেষ করে মুসলিম সমাজে কারো মৃত্যু হলে জানাযার ছালাত শেষ হওয়ার পর কবরস্থ করার পূর্বেই মাইয়্যেতকে সামনে রেখে সবাই হাত উপরের দিকে তুলে বিশেষ পদ্ধতিতে মুনাজাত করা হয়। অতঃপর মীলাদ-ক্বিয়াম ও ডাল-চালের খিচুড়ির আয়োজন করা হয়। তা না করলে কবরে সওয়াল-জাওয়াবে সমস্যা হয়ে থাকে। আর 'পাঁচা'র অনুষ্ঠানাদি না করলে কবরের যিন্দেগীতে সমস্যা হয়ে থাকে। হরমুজ আলীর দশ বছরের ছেলের পক্ষে বাবার 'পাঁচা'র অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। প্রতিবেশীরা চাঁদা তুলে মীলাদ-ক্বিয়াম ও শিরনির ব্যবস্থা করেন। উল্লেখ্য, 'দশা'র অনুষ্ঠানাদি হিন্দু সমাজ মাথা মুণ্ডানো, উপবাস থাকা, ঝাড়ু হাতে নিয়ে চলাফেরাসহ বেশ গুরুত্বের সাথে পালন করে। এক মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই 'চল্লিশা'র অনুষ্ঠানাদির জন্য এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সভায় বসেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে চল্লিশা না হলে পরজীবনে সমস্যা হয়ে থাকে। তাই সবাই চাঁদা তুলে চল্লিশার আয়োজনে যখন ব্যস্ত, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে হরমুজ আলী এসে হাযির। কাজের খোঁজে কয়েক মাইল দূরে গিয়ে তিনি এক মাসের চুক্তিতে ভাল বেতনে একটি কাজ পেয়ে যান। তাই তাঁর আসতে বিলম্ব হয়।

(চার)

আমার ছাত্রজীবনে দুপুরের নাস্তার নির্ধারিত একটি বাজেট ছিল। তবে এক সহপাঠী মাঝে-মধ্যে আমাকে উন্নতমানের নাস্তা করাত। একদিন সে আমাকে নিয়ে গেল আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনতিদূরে শাহজালালের মাযারে, সেখানে পুলিশ কর্মকর্তা তার মামা আসছেন। আমরা তাঁর জন্য মাযারের প্রধান গেইটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম। মামা আমাদের ভাল রেস্টুরেন্টে নাস্তা করিয়ে নিয়ে গেলেন শাহজালালের সব চেয়ে বড় ডেক্সির নিকটে। আমাদের দু'জনের হাতে দু'টি পাঁচ শত টাকার নোট দিয়ে ডেক্সিতে ঢালতে বললেন। অতঃপর আমাদের দু'জনের হাতে একশত টাকার দুটো নোট ধরিয়ে দিয়ে বিদায় দেন। বন্ধুটি আমাকে জানালো যে, মামার ভাল কামাই হলে শাহজালালের ডেক্সিতে আয়ের একটি অংশ দান করেন। তিনি মাঝে-মধ্যে মোটা অংকের কামাই করেন, অর্থাৎ মোটা অংকের ঘুষ পান। ঘুষের কিছু অংশ তিনি শাহজালালকে দিয়ে ঘুষের ভাগীদার বানিয়ে নেন, যাতে পরকালের শেষ বিচারের সময় শাহজালাল তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যান।

উল্লেখ্য, অতি সম্প্রতি (২০১৩) ঢাকার উচ্চ পদস্ত একজন পুলিশ কর্মকর্তা স্বীয় কন্যা 'ঐশী' কর্তৃক খুন হন। মিডিয়ার কল্যাণে জানতে পেরেছি যে, তিনি স্বীয় কন্যার পকেট খরচ বাবদ মাসিক এক লক্ষ টাকা দিতেন; যদিও তাঁর সর্বমোট বেতন ছিল ত্রিশ হাযারেরও নীচে। তবে তিনি তাঁর আয়ের অংশবিশেষ শাহজালাল-এর মাযারে দিতেন কিনা বিষয়টি মিডিয়া থেকে জানতে পারিনি। কেননা মিডিয়া ঐ সব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। জনশ্রুতি রয়েছে যে, শাহজালাল-এর বড় ডেক্সিটি শাহজালালের হাতের স্পর্শ লাভে ধন্য হয়েছে। তাই এ ডেক্সিতে দান করলে সরাসরি শাহজালালকে অংশীদার বানিয়ে দেয়া হয়। তাই অবৈধ আয় যারা করেন, তারা শাহজালালকে আয়ের অংশীদার বানিয়ে নিজেরা পাপমুক্ত হয়েছেন বলে আত্মতৃপ্তি অর্জন করেন। আর মাযারের খাদেমরা শাহজালালকে না দিয়ে গভীর রাতে ডেক্সি থেকে টাকাগুলো উঠিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নিয়ে যায় বলে সিলেট শহরের সচেতন অধিবাসীরা নিশ্চিত।

(পাঁচ)

আমার জন্মের সময় দাঈয়ের কাজ করেছেন আমার এক নিকটাত্মীয়া। তিনি ছালাতের ব্যাপারে অনেকটা শৈথিল্য প্রদর্শন করতেন। আমার ছাত্রজীবনে একদা তার কাছে ছালাতে গাফলতির কারণ জানতে চেয়েছিলাম। তিনি জানালেন, সিলেটের সর্বাধিক পরিচিত পীর ছাহেব একবার তাদের গ্রামে গিয়েছিলেন। গ্রামের লোকেরা পীর ছাহেবের পায়ে হাত দেয়ার জন্য হুড়োহুড়ি করছিল। এমতাবস্থায় পীর ছাহেব তার বাবাকে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। তার মতে, পীর ছাহেবের বুকে বুক লাগানো ব্যাটার বেটি তিনি। তার বাবার বুকটাতো অবশ্য জান্নাতে যাবে, কেননা পীর ছাহেবের বুক যার বুকে লেগেছে জান্নাত তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। এখন তার প্রশ্ন হল, বাবা জান্নাতে যাওয়ার সময় কী প্রিয় কন্যাকে রেখে যাবেন? চাচীর ধারণা অবশ্য তাঁর বাবা তাকে সাথে নিয়ে জান্নাতে যাবেন। জান্নাতে যাওয়াটা যেহেতু তার নিশ্চিত, সেহেতু তিনি মাঝে মধ্যে ছালাত একটু শৈথিল্য প্রদর্শন করেন।

আমার এই চাচীর ইন্তেকালের পর জানাযার ছালাতের দায়িত্ব পড়েছিল আমার উপর। আমাকে মানুষ করার পেছনে রয়েছে তার যথেষ্ট অবদান। তার পীর ছাহেব তখনও জীবিত। জীবিত পীর ছাহেব কিভাবে এই চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে ভক্তকে সহযোগিতা করবেন বিষয়টা আমার বুঝে আসছিল না। ভক্তের এমন অসহায় অবস্থার খবর পীর ছাহেবের কাছে কেউ পৌঁছায়নি। কেননা এ রকম অতি নগন্য ভক্তের জানাযায় তিনি আসার কথা নয়।

(ছয়)

(ক) শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হতে না হতেই হঠাৎ একটি ভিসা পেয়ে ১৯৯০ সনে মধ্যপ্রাচ্যের দোহা-কাতার চলে যাই। অল্প কিছুদিন সেলসম্যানের কাজ করার পর দোহার একমাত্র 'পুলিশ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট'-এর লোক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হই। পরীক্ষায় এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের আট সহস্রাধিক প্রার্থীর মধ্যে ন'শত জন প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হই। পরবর্তীতে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রায় আড়াই শত প্রার্থীর মধ্যে তেইশজন বাংলাদেশী নির্বাচিত হই। অতঃপর তিন মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একজন পুলিশ সদস্য হিসাবে কর্মজীবন শুরু করি। বাহিনীতে 'ফরীদ' নামে বাংলাদেশী দু'জন লোক ছিল। আমরা পরিচয়ের জন্য একজনকে 'শেখ ফরীদ' ও অন্যজনকে 'মিসকীন ফরীদ' নামে ডাকতাম। আর আব্দুল আযীয নামেও ছিল দু'জন। তাদেরকে পরিচয়ের জন্য একজনকে 'আব্দুল আযীয গরম সুন্নী' অন্যজনকে 'আব্দুল আযীয সিলেটী' বলে ডাকা হত। 'গরম সুন্নী' নামের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবশ্য আমার

কোন ধারণা নেই। চট্টগ্রামের সহকর্মীরা তাকে এ নামে নামকরণ করেছিল।

বছর খানেক পর হঠাৎ শুনলাম যে আমাদের আব্দুল আযীয গরম সুন্নী বর্তমানে জেলে আছেন। পরে জানা গেল আমাদের এ সহকর্মীর ডিউটি পড়েছিল একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায়। স্থানীয় মসজিদের বাংলাদেশী ইমাম ও আমাদের সহকর্মী পার্শ্ববর্তী কোম্পানীতে কর্মরত বাংলাদেশী লেবারদের নিয়ে মসজিদে আপত্তিকর কী কাজের অভিযোগে সবাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম শবেবরাত উপলক্ষ্যে তারা সবাই মসজিদে দাঁড়িয়ে মীলাদ পড়ছিলেন, আর আয়োজন করেছিলেন গরম গরম জিলাপির। পুলিশ জিলাপিসহ তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করেছে।

লেবাররা আদালতে দাঁড়িয়ে অজ্ঞতার কথা জানিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আদালত তাদেরকে তওবা পড়িয়ে ছেড়ে দেয়। অতঃপর ইমাম ছাহেব আদালতে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি হলাম একজন কুরআনের হাফেয। আমি আলিম নই। আমাদের দেশে মসজিদে শবেবরাত উপলক্ষে ঐ সব কাজ করতে দেখেছি। না জেনে কাজটি করে আমি অনুতপ্ত। তাকেও তওবা পড়িয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। অতঃপর আসে আব্দুল আযীয ভাইয়ের পালা। তাঁকে জেলে পাঠানো হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁকে সরবরাহ করা হয় বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীছের কিতাবাদী। পরদিন আদালতে উঠে তিনি শবেবরাত উপলক্ষে দু'টি হাদীছ আদালতে উপস্থাপন করেন। আদালত হাদীছ দু'টিকে প্রথমতঃ মেনে নিলেও এ দিনে মসজিদে দাঁড়িয়ে মীলাদ পড়ার পক্ষে কুরআন অথবা হাদীছের প্রমাণ দেখাতে বলেন।

অতঃপর সময় নির্ধারণ করে তাকে আবার জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আবারও তাঁকে সরবরাহ করা হয় বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীছের কিতাবাদী। তিনি নির্ধারিত তারিখে আদালতে দাঁড়িয়ে কিছু যুক্তি উপস্থাপন করেন। আদালত তাকে তওবা করার সুযোগ প্রদান করে। তিনি তওবা করতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে আবারো জেলে পাঠানো হয়। কয়েকদিন পর তাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

(খ) সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টে দায়িত্ব পালন করলেও মাঝে মধ্যে অপরাধীর বক্তব্য বিচারককে বুঝিয়ে দিতে আদালতে আমাদের কারো কারো ডাক পড়ত। একদা আমার ডাক আসে। আলোচ্য অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ নেই। তারপরও অনুমানের ভিত্তিকে সে অপরাধী। অপরাধীর বক্তব্য অনুবাদ করে শুনানোর পর আমি নিজ পক্ষ থেকে কুরআন কারীমের একটি আয়াত তেলাওয়াত করি। আদালতে উচ্চ স্বরে কথা বলা একটি অপরাধ। কিন্তু আমি উচ্চ স্বরে কুরআনের আয়াত পাঠ করার পর আদালত আমাকে তিরস্কার না করে বরং অপরাধের বিষয়ে অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দেন। তদন্তে সে নির্দোষ প্রমাণিত হলে আদালত তাকে মুক্তি দানের নির্দেশ প্রদান করেন।

আদালত সংশ্লিষ্ট ভারতীয় এক কর্মচারীর কাছ থেকে জানলাম যে, কোন অপরাধী তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে যদি কোন হাদীছ উপস্থাপন করতে পারে, তবে তার মুক্তির একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দেয়। আর যদি কুরআনের আয়াত শুনাতে পারে তবে মুক্তি প্রায় নিশ্চিত বলা যায়। এ আদালতে উকীল নিয়োগের কোন ব্যবস্থা নেই। আজ আপনি উকীলের মত কাজটাই করলেন।

উল্লেখ্য যে, এ দেশে কোন স্থানে কোন হাদীছ উল্লেখ করার পর হাদীছটি ছহীহ হলে তা মেনে নেয়া হয়। অথচ আমাদের দেশের কোথাও হাদীছ শুনানো হলে হাদীছটি স্বীয় ভাবধারার পুস্তকে আছে কি না এ জাতীয় বাহুল্য প্রশ্ন করা হয়ে থাকে।

(গ) পুলিশের সিকিউরিটি বিভাগে তিন শিফ্টে পালাক্রমে আমাদের চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি করতে হত। একদা আমার ফিলিপিনি এক সহকর্মীর ও আমার সাপ্তাহিক ছুটি হয়েছিল একই দিনে। এক সাথে বেড়াতে বের হওয়ার পর সে আমাকে নিয়ে গেল একটি ক্যাসেটের দোকানে। সেখানে সে একাধিক ক্বারীর তেলাওয়াত ও আধুনিক কিছু আরবী গানের ক্যাসেট কিনল। জানতে পারলাম দোহা শহরে তার স্ত্রীর পরিচালিত 'হাল্লাকা লিস সাইয়েদাত' বা মহিলাদের বিউটি পার্লারে দিনের বেলা বাঁজানো হয় বিভিন্ন প্রকার সাধারণ গানের ক্যাসেট। কেননা দিনে কাস্টমার আসে সাধারণতঃ আধুনিক মনের; তারা কোন অনুষ্ঠানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা যুব সমাজকে নিজ রূপ যৌবন দেখাতেই পার্লারে আসে। আর রাতের বেলা ব্যবসা জমে ওঠে। তখন সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণতঃ আসে ধার্মিক মহিলারা; তারা স্বীয় স্বামীর কাছে নিজেকে তুলে ধরতেই পার্লারে আসে। তাই রাতের বেলা বাজানো হয় কুরআনের তেলাওয়াত এবং রূপচর্চার উপকরণে তখন হালালের প্রসঙ্গ প্রাধান্য পায়। অথচ আমাদের দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সব স্তরের সকল ধার্মিক মহিলাই রূপচর্চাকে হারাম বলে জানেন।

(সাত)

১৯৯৪ সনে দেশে ফিরে মুদ্রণ ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ি। সাথে সাথে শিক্ষাজীবনের অসমাপ্ত পরীক্ষাগুলোতে একে একে অংশগ্রহণ করি। ব্যবসার প্রথম দিক থেকে শ্রীমঙ্গলের জনৈক মাওলানা মাস খানেক পর পর বই ছাপার কাজে আমার কাছে আসতেন। আমাকে প্রায় একাই তখন কম্পিউটার কম্পোজ, কারেকশন, ফরমেটসহ সবকিছুই করতে হত। সে সুবাদে মাওলানা ছাহেবের লেখনি ভাল করে পড়া হয়ে যেত। হিসাব অনুযায়ী দেখা গেল তিনি আমার ক্লাস মেট। সম্ভবতঃ ১৯৯৯ সনে তাঁর একটি বইয়ের কাজ করার সময় বললাম, আমি একজন সুন্নী মুসলিম হতে চাই। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাঁকাচ্ছিলেন। আমি বললাম, রসে ভর্তি ফলকে বলা হয় আনারস, দানায় ভর্তি ফলকে বলা হয় বেদানা ঠিক সেভাবে সুন্নী হতে হলে হাদীছের খেলাফ কাজ করতে হবে বলে আপনাদের লেখনি থেকে জেনেছি। এখন আমি জানতে চাচ্ছি আমাকে একজন সুন্নী হতে হলে আর কী কী কাজ করতে হবে? তিনি আমার কথায় মনক্ষুণ্ন হয়ে বললেন যে, সুন্নী বেশ কয়েকজন মিলে শ্রীমঙ্গলেই আমরা একটি প্রিন্টিং প্রেস করার উদ্যোগ নিয়েছি। সম্ভবতঃ আগামি বইটি ছাপার জন্য আমাকে আপনার কাছে আর আসতে হবে না। সত্যিই তিনি আর কোন দিন আমার কাছে আসেননি। *(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)*।

ইতিহাস কথা বলে : পর্ব-৩

-মেহেদী আরীফ

ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার সূর্য সন্তানেরা

ভারতের অস্তমিত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের অভিপ্রায়ে, স্বাধীনতাকামী মানুষের মুখে একটু হাসি ফোটানোর জন্য নিজেদের জীবনকে যারা সঁপে দিয়েছেন, তাঁরা আজ হারিয়ে যাচ্ছেন সাধারণের মনের খাতা থেকে, পুরাতন পুস্তকের জীর্ণশীর্ণ পৃষ্ঠা থেকে, ঐতিহাসিকদের কলমের আঁচড় থেকে। ইতিহাস বিজেতাদের পক্ষে লেখা হয়। আজ ইতিহাসের ফাঁপা বেলুন ঐতিহাসিকের কলমের খোঁচায় চোপসে গেছে। ঐতিহাসিকের কলম আজ ভোঁতা হয়ে গেছে, মিথ্যা ইতিহাস লিখে লিখে মরিচা ধরেছে তাদের কলমে। ইতিহাস নিজে নিজে তৈরি করলে সেটা ইতিহাস হয় না, সর্বোচ্চ সেটা একটা সাহিত্য কর্ম কিংবা বিশাল এক গ্রন্থের স্তূপ তৈরী হয়। ইতিহাসের ঘটনাকে পুঁজি করে এলোমেলো করে সাজালে সাহিত্য লেখার পাশাপাশি মানুষকে অপমানও করা হয়। ইতিহাসের মহানায়কেরা যদি ভিলেনে পরিণত হন, তার জন্য দায়ী একজন ভ্রান্ত ঐতিহাসিক, একজন চাটুকার সাহিত্যিক কিংবা একজন লোভী বক্তা।

মানুষের মগযে ভ্রান্তির ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে দেওয়ার পিছনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ঐতিহাসিক আর সাহিত্যিকেরা। তিলকে তাল করার কারণে মানুষের মগযে বিশ্বাসের জায়গাটা ফাঁপা বেলুনের মত হয়ে গেছে। মানুষ তাই ক্ষুধার্ত কাকের মত সত্য ও মিথ্যা হাতড়াতে থাকে। একটা অসাধারণ সৃষ্টিকে কেউ যদি নতুন করে আবার সৃষ্টি করতে চায়, তাহলে তা বোকামির সর্বোচ্চ মাত্রাকে অতিক্রম করে। ভারতের ইতিহাসের অনেক সত্য ঘটনা ও চরিত্রকে আড়াল করে অবুঝ সাহিত্যিকেরা চরিত্রের মহিমা বর্ণনা করে কিংবা চরিত্রকে কলুষিত করে এমনভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন, যে সাধারণ পাঠকশ্রেণী এটাকে অসাধারণ মনে করে উল্টো পথে উল্টো রথে হাঁটা শুরু করেছে। বিকৃত লেখা উপযুক্ত পাঠকের কাছে ধিকৃত হলেও সাধারণের কাছে যে স্বীকৃত এ ব্যাপারে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকার কথা নয়। ইতিহাসের কালো অধ্যায় মানুষের জ্ঞানের সীমা-পরিসীমার বাইরে চলে গেলে মানুষ যা পড়ে তাতেই বিশ্বাস স্থাপন করে। আলোচনা-সমালোচনা কিংবা পর্যালোচনার তোয়াক্কা না করে পাঠকগণ নিজেদের মনগড়া তথ্যে ভরাট করেছেন পৃষ্ঠা, তৈরি করেছেন ইতিহাস, এ যেন কারিগরের হাতে গড়া শিবের মূর্তি। ভারতের ইতিহাস থেকে মুসলিম নেতৃত্বের ও কৃতিত্বের প্রভাব দারুণভাবে এড়িয়ে গেছে মিথ্যুক ঐতিহাসিকদের ধারালো কলম। এখন সময় এসেছে সত্য কথা অকপটে স্বীকার করার। সত্য চিরদিন সত্য, মিথ্যার ফ্রেম থেকে এক সময় সত্য বের হয়ে এসে সকালের সূর্যের মত জেগে ওঠে আপন শক্তিতে। ভারতের স্বাধীনতার সূর্য সন্তানদের ইতিহাস পাঠকদের অনুপ্রেরণার দারুণ এক উৎস হিসাবে কাজ করবে। সত্য ইতিহাস পাঠককে নিজেদের জ্ঞানের অসারতাকে অগ্রাহ্য করে সত্য জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণের পরিবেশ তৈরি করবে ইনশাআল্লাহ।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) : ভারতের স্বাধীনতা বিপ্লবের ইতিহাসের প্রথম মশালবাহক

জন্ম ও বংশ পরিচয় :

শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে উত্তর ভারতের মুযাফফরনগর যেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মূল নাম আহমাদ, উপাধি আবুল ফাইয়ায, ঐতিহাসিক নাম আযীমুদ্দীন। তবে বিশ্বে তিনি অলিউল্লাহ নামে সমধিক পরিচিত।

ভারতগুরু শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ)-এর ৩১তম উর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন খীলফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) এবং তাঁর মাতা ছিলেন ইমাম মূসা আল-কাজিমের বংশধর। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) ছিলেন মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহঃ)-এর আদর্শ ও চিন্তা-চেতনার বলিষ্ঠ উত্তরাধিকারী ও মানস সন্তান।

শিক্ষা জীবন :

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, ‘Morning shows the day’ দিনটি কেমন যাবে তা সকালকে দেখে আঁচ করা যায়। তাই বুঝি ভারতবর্ষের ভগ্ন সমাজে অলিউল্লাহর উপস্থিতিতে একজন মহা মনীষীর আগমনী বার্তা পাওয়া গিয়েছিল। অত্যন্ত মেধাবী এই ভারতরত্ন ‘যুযবে লতীফ’ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ‘যখন আমার বয়স পাঁচ বছর, তখন মক্তবে ভর্তি হই এবং আমার পিতার নিকট ফার্সী ভাষা শিক্ষা করি। সাত বছর বয়সে আমার পিতা আমাকে ছালাত আদায়ের অনুমতি দেন এবং ঐ বছরে আমি কুরআনের হিফয সমাপ্ত করি’। পনের বছর বয়সে তিনি তাফসীর, হাদীছ, ফিক্ব্‌ হ, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যামিতি ইত্যাদি বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন, যা কোন মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এই পনের বছর বয়সেই তিনি পিতার নিকট থেকে আধ্যাতিকতার সবক গ্রহণ করেন। মাত্র সতের বছর বয়সে তিনি পিতার নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ করার অনুমতি পান। ১১৪৩ হিজরীতে তিনি মদিনা গমন করেন এবং শায়খ আবু তাহের কুর্দীর সান্নিধ্যে এসে ছহীহ বুখারীর পাঠ শুরু করেন।

তাঁর কাছ থেকে তিনি হাদীছ পাঠদান ও সনদ প্রদানের অনুমতি লাভ করেন। উস্তাদ কুর্দী ছাহেব প্রায়ই তাকে বলতেন, ‘অলিউল্লাহ আমার নিকট থেকে শব্দের সনদ নিচ্ছে, আর আমি তার নিকট থেকে অর্থের সনদ নিচ্ছি’।

কর্মজীবন :

শাহ্ ছাহেবের বয়স যখন মাত্র সতের তখন তাঁর প্রাণপ্রিয় পিতা মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মাদরাসা রহীমিয়াতে শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। তিনি একটানা বার বছর এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থান-পতন দেখে তিনি খুবই বিচলিত হন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, পথভোলা মুসলিম উম্মাহকে চলমান অন্ধত্ব ও কুসংস্কার থেকে বাঁচাতে হলে তিনটি বিষয়ে তাদেরকে প্রজ্ঞাবান হওয়া অতীব প্রয়োজন। বিষয়গুলো হল-

১. যুক্তিদর্শন : তর্কশাস্ত্রের মনগড়া প্রশ্নের অযথা আমদানিতে মুসলিম মননে নানা ধরনের ফেতনা-ফাসাদ এসে দানা বাঁধে। মুসলিম সমাজ গ্রিক দর্শনের আমদানিতে মগজকে পরিপুষ্ট করার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। সুতরাং এই সমাজকে মুক্ত করতে গেলে যুক্তিদর্শনের চর্চা করতে হবে। বিষয়টি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত।

২. আধ্যাত্মিক দর্শন : তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় ছূফীবাদের প্রভাব খুব বেশি প্রকট হয়েছিল। কুরআন ও সুন্নাহকে বাদ দিয়ে মানুষ আধ্যাত্মিক সাধনার ভিতরে হাবুডুবু খাচ্ছিল। আধ্যাত্মিক সাধনা সে যুগে শিক্ষার একটা বড় অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। এ কারণে শাহ্ ছাহেব ভাবলেন যে, এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের ধারণা থাকতে হবে।

৩. ইলম বির-রিওয়ায়াহ : নবী করীম (ছাঃ)-এর মাধ্যমে যে জ্ঞান পৃথিবীব্যাপী প্রসার লাভ করেছিল তা হল, কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র জ্ঞান। মানুষ যাতে করে মস্তিষ্ক প্রসূত কোন কথা বা কাজ না করে, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে যেন নিজের খেয়াল খুশি ও দলীয় গোঁড়ামীর আবরণে বন্দি না হয়, সে জন্য শাহ ছাহেব আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

মানুষের ভিতরকার আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মঅহমিকা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার একটা সাধারণ চিত্র ছিল। মানুষের মাঝে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বার্তা পৌঁছিয়ে দেওয়া ছিল তাঁর লক্ষ্য। কারণ তিনি চেয়েছিলেন কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক একটি শক্তিশালী মুসলিম সমাজ।

গ্রন্থাবলী :

শাহ অলিউল্লাহ ১১৪৬ হিজরীতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছর যাবৎ শুধু রচনার কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন।

ভারতগুরু শাহ অলিউল্লাহ প্রণীত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা শতাধিক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তাঁর সব বইগুলো সংরক্ষিত হয়নি। তার লিখিত বইয়ের ভিতরে কুরআন মাজীদের তরজমা 'ফৎহুর রহমান' উল্লেখযোগ্য। এটা কুরআনের সংক্ষিপ্ত অথচ জ্ঞানগর্ভ তরজমা। তার এ পর্যায়ে গ্রন্থের মধ্যে মুক্বাদ্দমা ফী তারজুমাতিল কুরআন, আল-ফাওযুল কবীর এবং আল-ফাতহুল কাবীর। তাঁর হাদীছের উপর লিখিত গ্রন্থের মধ্যে ইমাম মালিকের বিশ্বখ্যাত মুওয়াত্ত্বার আরবী শরাহ। ফিকহ শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে আল-ইনছাফ ও ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ। তাছাউফ সংক্রান্ত বইয়ের মধ্যে ফায়াসালাতু ওয়াহাদাতিল ওয়াজুদ ওয়াশ শাহুদ, আল-ক্বওলুল জামীল, তাফহীমাতুল-ইলাহিয়া, ফয়যুল হারামাইন, আল-খায়রুল-কাসীর, সাৎয়াত ও লুময়াত বিখ্যাত। এছাড়া হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ তার জগদ্বিখ্যাত এক গ্রন্থ। মাওলানা মনযির আহসান গিলানীর ভাষায়, 'আমি এ গ্রন্থটির ন্যায় মানব রচিত এমন কোন গ্রন্থ দেখিনি, যাতে ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন-বিধান হিসাবে সুসংবদ্ধভাবে তুলে ধরা হয়েছে'।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী তাঁর 'নেজামে তালীন' নামক পুস্তকে মন্তব্য করে বলেন, 'আমার মতে আল্লাহ্র কিতাব ও সুন্নাহ্র পরে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট কিতাব। কেননা এতে এমন সব জ্ঞান সমৃদ্ধ বিষয় রয়েছে, যা অপর কোন গ্রন্থে নেই, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কানে শোনেনি, এমনকি কেউ অন্তর দিয়েও উপলব্ধি করেনি। মূলত এটা হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা, অথচ পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বরং বলা চলে মুহাম্মদী শরী'আতের নির্যাস'।

শাহ্ অলিউল্লাহ্র সংস্কার আন্দোলন ও বিপ্লবী কর্মসূচী :

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে ইংরেজদের একচেটিয়া রাজত্ব মুসলমানদের মেরুদণ্ডকে ভেঙে দিয়েছিল। মুসলিমদের শোচনীয় পরাজয়ের পিছনে যে বিষয়টি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল তা হল তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতন।

উপমহাদেশের সংকটময় মুহূর্তে হাতে গোনা যে কয়জন সাহসী নওজোয়ান, বীর-মুজাহিদ মুসলমানদের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চিন্তায় বিভোর ছিলেন শাহ্ অলিউল্লাহ তাদের মাঝে অন্যতম এক পুরোধা ব্যক্তিত্ব। সাম্রাজ্যবাদীদের কাল থাবা ও নীল নকশা থেকে ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলতে তিনি ইসলামী সংস্কার আন্দোলনে মন দেন। সমাজের বুকে প্রচলিত অনৈসলামিক রীতিনীতি, অনাচার ও কুসংস্কারের নিত্য খেলার মূলোৎপাটন করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেন। পীরপূজা, কবরপূজা, কেরামতি প্রভৃতির উচ্ছেদের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ছূফীবাদের নেতিবাচক প্রভাব সমাজকে করে তুলেছিল বিকৃত ও কলুষিত। তিনি ছূফীবাদকে ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন।

বস্তুবাদী চিন্তার বন্যায় ভেসে গিয়েছিল মুসলিম উম্মাহ্র অনুর্বর মস্তিষ্ক। বস্তুবাদীদের পুশ করা ইনজেকশনে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল মুসলিম মনন। আলো-আঁধারের ভেল্কিতে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বিপদগামী হয়ে পড়া মুসলিমদেরকে জাগিয়ে তুলতে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেন, যা তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় প্রমাণ মেলে। সবকিছু যে কুরআন ও সুন্নাহ্র কষ্টি পাথরে চমৎকারভাবে পরিবেশন করা যায় তা তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মন, মেজাজ, খাদ্যাভ্যাস, চাল-চলন, আচার-আচরণ, রীতি-নীতিতে পরিবর্তন ঘটে। মাঝেমাঝে মানুষ নতুনকে এমনভাবে শুভেচ্ছা জানায়, যে তাঁর অতীত বলতে আর কিছু থাকে না। তখন তারা মিছে আলেয়ায় দৌঁড়াতে থাকে। দিগ্বিদিক ছুটতে থাকা এই অবুঝ মানুষগুলোকে নিয়ে শাহ্ ছাহেব খুব বেশি ভেবেছিলেন। ধর্মীয় বিধিবিধানকে সহজভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করার অভিপ্রায় ছিল তার চমৎকার একটা দিক।

তিনি কুরআন ও হাদীছকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু ইসলামের সনাতন ধারা থেকে বের হয়ে আসেননি। কারণ ইসলাম কারও ইচ্ছায় পরিচালিত হয় না। তিনি বিশ্বাস করতেন, এটা আল্লাহ্র দেওয়া একটা জীবন ব্যবস্থা। কারও মনগড়া সিদ্ধান্তে ইসলাম এক পাও আগাতে পারে না, এটাই শরী'আত।

মক্কা-মদীনায় অবস্থানকালে শাহ ছাহেব ইজতিহাদের উপযোগী গুণাবলী ও যোগ্যতা অর্জন করেন। শিবলী বলেন, 'ইবনে রুশদ ও ইমাম ইবনে তাইমিয়ার পর মুসলিম জগতের যে চরম অবনতি ঘটেছিল, তাকে পুনরায় উজ্জীবিত করেন শাহ্ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ)।

অলিউল্লাহ ছাহেব মক্কা গমনের আগে সমাজকে যেমন দেখেন, মক্কা থেকে দেশে ফেরার পর সমাজের অসারতা তার চোখে আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ ভুলে গিয়ে ভণ্ড পীরের মুরীদ বনে গিয়েছিল। আবুল মুযাফফর মুহিউদ্দিন আলমগীর আওরঙ্গজেব চেয়েছিলেন উপমহাদেশে মহানবী (ছাঃ)-এর আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করতে। আর তার অযোগ্য ভাই দারাশিকো চেয়েছিলেন প্রপিতামহ আকবরের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে। এর পর থেকে মুসলিমদের ভিতরের ঐক্য বিনষ্ট হতে শুরু করে। মানুষেরা নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দেখানো পথের চেয়ে পীরের দেওয়া ফাঁকা বুলি শোনার দিকে বেশি মন দিতে শুরু করে। তার সংস্কার আন্দোলনের মূল দাবী ছিল, 'প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে সমাজ গড়তে হবে এবং বর্তমানে যে শাসন ব্যবস্থা রয়েছে তা পরিবর্তন করে নতুনভাবে শাসন ব্যবস্থা তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন।

মুঘল সাম্রাজ্যের অধিপতি যহীরুদ্দীন মুহাম্মাদ বাবরের পুত্র হুমায়ুনের শাসনামলে ইরানী শী'আদের মোঘল রাজ দরবারে প্রভাব বৃদ্ধি পেলে গ্রিক দর্শনের অনুপ্রবেশ বেশ প্রবল হয়। গ্রিক দর্শনকে জ্ঞানের মাপকাঠি তৈরি করার কারণে কুরআন ও সুন্নাহ্র গুরুত্ব অনেকটা ঠুনকো হয়ে যায়। এমতাবস্থায় শাহ্ অলিউল্লাহ (রহঃ) সর্বাগ্রে কুরআন ও সুন্নাহ্র গুরুত্বকে তুলে ধরে মাদ্রাসায়ে রহীমিয়ার সিলেবাসে আমূল পরিবর্তন আনেন, যা মুসলিম উম্মাহ্র জ্ঞানের পথে বিরাট এক দিগন্ত উন্মোচন করে।

আকবরের শাসনামলে ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। তার প্রচলিত দ্বীন-ই-ইলাহীর প্রভাবে মুসলিমরা শরী'আতের মূল থেকে ক্রমশঃ ছিটকে পড়ছিল। এ রকম সংকটময় মুহূর্তে শাহ্ ছাহেব ভাবলেন যে, কুরআন ও সুন্নাহ্র যথাযথ প্রচার ও প্রসার হওয়া উচিত। সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নিমিত্তে তিনি কুরআনের ফারসী অনুবাদ করেন, যার নাম 'ফাৎহুর রহমান'। এ কাজ করতে গিয়ে তাকে অনেক বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এক শ্রেণীর অর্ধ শিক্ষিত আলেম তার এই প্রচেষ্টাকে কুফরীর সমতুল্য গণ্য করে। এক পর্যায়ে তাকে কাফের বলে ফৎওয়াও দেওয়া হয়। কিন্তু বকের দো'আতে যে গাঙ শুকিয়ে যায় না এটা তারা স্পষ্ট বুঝে উঠতে পারেনি। শাহ্ ছাহেব কুরআন ও হাদীছের প্রচার ও প্রসারে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেন। তার প্রথম কর্মসূচী ছিল মানুষকে কুরআনের পথে আহ্বান জানানো। কারণ তৎকালীন সময়ের মানুষেরা শিরক ও বিদ'আতের সাগরে এমনভাবে হাবুডুবু খাচ্ছিল যে, হাদীছের উপর মানুষের বিশ্বাস ঠুনকো হয়ে পড়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তিনিই প্রথম হাদীছের দারস চালু করেন। [*ক্রমশঃ*]

[লেখক : এম. এ ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

সংগঠন সংবাদ

কেন্দ্র সংবাদ

যুব সমবেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১লা মার্চ শনিবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২৪তম তাবলীগী ইজতেমা ২০১৪-এর দ্বিতীয় দিন সকাল ১০টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনের উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার মুহাদ্দিছ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, 'আন্দোলন'-এর সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন, সাবেক সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন, 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মেছবাহুল ইসলাম, কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জামিলুর রহমান, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হুমায়ূন কবীর, 'যুবসংঘ'-এর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া, বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রাযযাক। সুদৃশ্য প্যান্ডেল দিয়ে ঘেরা যুব সমাবেশটি শত শত কর্মী ও কাউন্সিল সদস্য এবং দায়িত্বশীল দ্বারা কানাই কানাই পূর্ণ ছিল।

কর্মী সমাবেশ

চাঁদমারী, পাবনা ১১ মার্চ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' পাবনা যেলা কর্তৃক আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি তারেক হাসান, 'আন্দোলন'-এর সঊদী আরব শাখার প্রচার সম্পাদক সোহরাব হোসাইন প্রমুখ।

সাবগ্রাম, বগুড়া ১৫ মার্চ শনিবার : অদ্য বাদ আছর সাবগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বগুড়া সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক এক 'যুব সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। যেলা যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রাযযাক বিন তমিযদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা আব্দুর রহীম, 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান, 'যুবসংঘ'-এর গাইবান্ধা (পশ্চিম) যেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন, জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মুহম্মিাদ আমীনুল ইসলাম প্রমুখ।

গোপালনগর, মুজিবনগর মেহেরপুর ১৬ মার্চ রবিবার : অদ্য বেলা ২ টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলা কর্তৃক আয়োজিত এক যুব সমাবেশের আয়োজন করা হয়। মুজিবনরগ উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আজমাতুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুর বাছীর, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তারিকুযযামান বাচ্চু, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুনিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাশার আব্দুল্লাহ, অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন মেহেরপুর পৌর ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক আহছানুল্লাহ হক্ব।

ষষ্টিতলা, যশোর, ২২ মার্চ শনিবার : অদ্য বিকাল ৩ ঘটিকায় ষষ্টিতলা টাউন হল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মোঃ আশরাফুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ইবাদুল্লাহ বিন আব্বাস, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি হাফেয তরীকুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট, ৩০ মার্চ, রবিবার : অদ্য সকাল ১০ টা হ'তে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে জয়পুরহাট যেলা পরিষদ মিলনায়তনে (টাউন হলে) এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুব সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর। অন্যান্যের মধ্যে বিষয় ভিত্তিক বক্তব্য প্রদান করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক

সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, বর্তমান সহ-সভাপতি আব্দুন নূর, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহমান, অর্থ সম্পাদক ফিরোজ হোসেন, প্রচার সম্পাদক মুছতাক আহমাদ সরোয়ার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আল-আমীন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবু বকর, দফতর সম্পাদক আব্দুল মুত্তালিব, গাইবান্ধা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন, দিনাজপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক রায়হানুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মাহফুযুর রহমান, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহীম, 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি শহীদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি উলফত মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক মুযাম্মেল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক ডাঃ মাওলানা মিযানুর রহমান, মাওলানা আব্দুর রহমান প্রমুখ। জাগরণী পরিবেশন করেন মাহমুদুল হক এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক।

খাঁসবাগ, রংপুর ১ এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর রংপুর যেলা কার্যালয় খাঁসবাগে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার খায়রুল আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন

নবীনগর, খুলনা ৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০ টায় নবীনগর মুহাম্মাদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শু'আয়ব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

কোরপাই, কুমিল্লা ৫ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৩ টায় কোরপাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা জামিলুর রহমানের স্বাগত ভাষণ ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সফিউল্লাহর উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাকেব কেন্দ্রীয় সাধরাণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহ উদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

যেলা সংবাদ

চাঁদপুর ৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর সদর থানাধিন বাখরপুর কবিরাজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চাঁদপুর 'যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন '-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীল শামসুর রহমান আযাযী, 'সোনামণি'-এর কুমিল্লা যেলার পরিচালক মাওলানা আতীকুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'যুবসংঘ'-এর কুমিল্লা যেলার সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হেমায়েত হোসেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ৫০ জন যুবক উপস্থিত ছিলেন।

কমরগ্রাম, জয়পুরহাট, ২১ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ কমরগ্রাম আহলেহাদীছ বড় জামে মসজিদে এলাকা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুস্তাফিযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মদ আবুল কালাম, যেলা 'সোনামণি'-এর পরিচালক মোনায়েম হোসেন, কমরগ্রাম শাখার সহ-সভাপতি নাজমুল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুযযামান, অর্থ সম্পাদক হেলাল উদ্দীনসহ এলাকা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ।

দিনাজপুর (পশ্চিম) ৮ মার্চ শনিবার : অদ্য বাদ এশা মুহাব্বতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ এক কর্মী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইদরীসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। তিনি সাংগঠনিকভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার গুরুত্ব সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিকের ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

অ্যাডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, পাবনা ১৪ মার্চ শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০টায় অ্যাডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে 'যুবসংঘ'-এর পাবনা যেলা কর্তৃক আয়োজিত এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুল বারী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি তারেক হাসান প্রমুখ।

বালুয়াঘাট, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা (পশ্চিম) ১৯ মার্চ বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব বালুয়াঘাট বাজার আবু হানিফ মোল্লার দোকানে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা

'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি আবু হানিফ মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গোবিন্দগঞ্জ কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সহকারী ইমাম মুহাম্মাদ হাসান। পরিশেষে মুছত্বফাকে সভাপতি ও আব্দুল জলীলকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট বালুয়াঘাট শাখা গঠন করা হয়।

ধুনদিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা (পশ্চিম) ২১ মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব ধুনদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পলাশবাড়ী উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আশিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হওয়া উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'সোনামণি'-এর পরিচালক হাফেয ওবাইদুল্লাহ প্রমুখ।

পাঁচগড়গড়িয়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা ২১ মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব পাঁচগড়গড়িয়া আহলেহদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা আব্দুল আযীয মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন 'সোনামণি'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মাওলানা আবু নো'মান গাইবান্ধা পূর্ব যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মশিউর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইউনুছ আলী, অত্র শাখার অর্থ সম্পাদক সায়ু মিঞা। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন অত্র শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাঈদ প্রমুখ।

সোনামণি যেলা সম্মেলন ২০১৪

এম. মনছুর আলী অডিটরিয়াম, সিরাজগঞ্জ ১৫ মার্চ শনিবার : অদ্য সকাল ১০ ঘটিকায় সিরাজগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এম. মনছুর আলী অডিটরিয়ামে **'সোনামণি যেলা সম্মেলন ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২০১৪'** অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মর্তুযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'সোনামণি'-এর পৃষ্ঠপোষক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর প্রথম পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, 'সোনামণি'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল রশীদ, কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান, সাখাওয়াত হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও যেলা 'সোনামণি'-এর উপদেষ্টা শরীফুল ইসলাম, রাজশাহী মহানগরী 'সোনামণি'-এর সহ-পরিচালক যাকারিয়া, মারকায এলাকা 'সোনামণি'-এর পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মামুন, সহ-পরিচালক মুনীরুল ইসলাম, মারকায এলাকার হাসনাহেনা শাখার পরিচালক সাখাওয়াত হোসাইন, রজনীগন্ধা শাখার পরিচালক আব্দুল হাকীম, সূর্যমুখী শাখার পরিচালক আব্দুল মুমিন, শহীদুল্লাহ, শাহ আলমসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ। উল্লেখ্য উক্ত অনুষ্ঠানটি সোনামণি ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। পরিশেষে আব্দুল মুমিনকে পরিচালক করে ২০১৩-২০১৫ সেশনের জন্য সোনামণি সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন করা হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

দারুলহাদীছ আহমাদিয় সালাফিইয়া কমপ্লেক্স, বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২০ মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৫ ঘটিকায় দারুলহাদীছ আহমাদিয় সালাফিইয়া কমপ্লেক্সে জে.ডি.সি এবং পি.এস.সি পরীক্ষার্থীদের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমানসহ 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি'-এর সাতক্ষীরা যেলার বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ ও বাঁকাল মাদরাসা শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী এবং সুধীবৃন্দ।

দরিদ্রদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

কমরগ্রাম, জয়পুরহাট, ১৫ জানুয়ারী বুধবার : অদ্য বিকাল ৩ টায় কমরগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জায়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার সমাজকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগ গরীব ও দরিদ্রদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। কম্বল ও শীতবস্ত্র বিতরণের উক্ত অনুষ্ঠানে যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম সভাপতিত্ব করেন। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মোঃ নাজমুল হকের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ও বক্তব্য প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছির। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলার কমরগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামরুল ইসলাম, আলহেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান শফীকুল ইসলাম, ইউপি সদস্য গোলাম মোর্শেদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি উলফৎ মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক মুযাম্মেল হক, যেলা 'সোনামণি'-এর পরিচালক মোনায়েম হোসেন, বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রাযযাক, গাইবান্ধা যেলা যুরসংঘের সভাপতি আব্দুল্লহ আল-মামুন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও সাংবাদিক আমীনুল ইসলাম, সাংবাদিক মতলুব হোসেন, যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর দায়িত্বশীল ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ প্রমুখ।

বাঁকালের সংবাদ

দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া, বাঁকাল, সাতক্ষীরার সাফল্য : ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স থেকে জে.ডি.সি ও সমাপনী পরীক্ষায় যথাক্রমে ১ জন ও ৩ জন ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়ে কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছে। বৃত্তিপ্রাপ্তদের নাম নিম্নরূপ : জে.ডি.সি-তে রাশেদুযযামান (বুলারাটি); সমাপনী-তে আশীকুযযামান (ভাদিআলী), ছাকিব মোল্লা (গোপালগঞ্জ) ও ইরাফিল হোসাইন (পাঁচরোখী)। এছাড়াও সমাপনী পরীক্ষায় মোট ৭ জন সাধারণ বৃত্তি পেয়েছে।

আইকিউ

[কুইজ-১; কুইজ-২; বর্ণের খেলা-৩ ও সংখ্যা প্রতিযোগ-৪-এর সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ৩০ এপ্রিলের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সর্বোচ্চ উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। বিভাগীয় সম্পাদক]

কুইজ ১/৬ (১) :

১. সৈয়দ আহমাদের 'দাওয়াত ও জিহাদ' কর্মসূচি কয়ভাগে বিভক্ত?
২. ভারতের স্বাধীনতা বিপ্লবের প্রথম মশালবাহক কে?
৩. শাহ অলিউল্লাহ কত হিজরীতে বুখারীর দারস গ্রহণ করেন?
৪. 'ফৎহুর রহমান' কী ধরনের গ্রন্থ?
৫. যহীরুদ্দীন মুহাম্মাদ বাবর কে?
৬. 'দ্বীনে ইলাহী'-এর প্রবক্তা কে?
৭. সোনামণিদের আয়ত্বে আনার কৌশল কয়টি?
৮. নিয়মতান্ত্রিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য কয়টি?
৯. আলেমগণ কাদের উত্তরাধিকারী?
১০. কমিউনিষ্টদের আদর্শ কে?
১১. 'বিশ্ব ইজতেমা' প্রথম কত সালে এবং কোথায় যাত্রা শুরু হয়?
১২. 'বিশ্ব ইজতেমা' কত একর জমির উপর অনুষ্ঠিত হয়?
১৩. দেশে মোট কতটি টিভি চ্যানেল রয়েছে?
১৪. HBO কী?
১৫. 'পাঁচা' কী?

গত সংখ্যার কুইজের উত্তর : ১. অলিউল্লাহ ইবনু হুসামুদ্দীন আল-মুত্তাক্বী (৮৮৫-৯৭৫) ২. মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী নহ্রওয়ালী (৯২৪-৯৮৫) ৩.দিল্লীর মাদরাসা রহীমিয়া ৪. কুতুবুল ইসলাম ৫. রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে। ৬. ১৯১৮ ৭. ১৯৭৯ সালের ২০ নভেম্বর ৮. ৪৪৮টি ৯. ৯৮ বার ১০. উত্তর প্রদেশের। ১১. কার্যালয় বা দফতর ১২. রিকশা ১৩. পাকিস্তানে ১৪. ইমরান খান; পাকিস্তানে ১৫. এক প্রকার ঘাস।

গত সংখ্যায় বিজয়ীদের নাম : ১. মীযানুর রহমান (মোহনপুর, রাজশাহী) ২. আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী) ৩. ফয়সাল মাহমূদ (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী)

কুইজ ১/৬ (২) :

১. শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ)-এর জন্ম-মৃত্যু সাল কত?
২. নযীর হোসাইন দেহলভী কোন মাদরাসার শায়খুল হাদীছ ছিলেন?
৩. দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন কত সালে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে?
৪. জিহাদ আন্দোলনের সময় আহলেহাদীছগণ কি নামে পরিচিত হত?
৫. ৩৭ হিজরীতে মুসলিম সমাজে কয়টি দল পরিদৃষ্ট হয় এবং কী কী?
৬. হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয় কে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন?
৭. কিসের জন্য হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজন হয়েছিল?
৮. হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের প্রথম রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ কে গ্রহণ করেন?
৯. আহমাদ ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু সাল কত?
১০. ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকারের নাম কী?
১১. ৩৭ হিজরী সালের পূর্বেকার মুসলিমরা কী নামে অভিহিত হত?
১২. আহলেহাদীছদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
১৩. আহলেহাদীছগণের ইস্তিদলালী প্রধানত পদ্ধতি কী?
১৪. আহলেহাদীছগণ মিসর, সুদান, থাইল্যাণ্ড, শ্রীলঙ্কা সহ প্রভৃতি দেশে কী নামে পরিচিত?
১৫. মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে আহলেহাদীছগণ কী নামে পরিচিত?
১৬. সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়াতে আহলেহাদীছগণ কী নামে পরিচিত?
১৭. ভারতীয় উপমহাদেশে আহলেহাদীছগণ কী নামে পরিচিত?
১৮. আহলুল আছার, মুহাদ্দেছীন, আছারী প্রভৃতি এগুলো কাদের নাম?
১৯. উপমহাদেশে আহলেহাদীছদের মধ্যে কয়টি দল আছে?
২০. 'গোবরায়ে আহলেহাদীছ' ও 'মুজাহেদীন' কিসের নাম?

বর্ণের খেলা ৩/৬ :

নির্দেশনা :

বৃত্তের প্রতিটি অংশে একটি করে অর্থবোধক শব্দ দেয়া আছে। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি কিংবা দুটি অক্ষর খুঁজে পাবেন না। এ বর্ণগুলো বের করে পুনর্বিন্যাস করলে নবী-রাসূলদের মৌলিক কাজের নাম জানা যাবে।

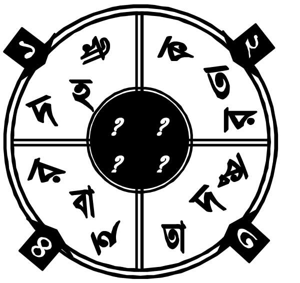

১.........................
২.........................
৩.........................
৪.........................

অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা নাম.....................

গত সংখ্যার বর্ণের খেলার উত্তর : (১) ইবাদত (২) মাজহুল (৩) ইতেক্বাদ (৪) জামা'আত; **অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা নাম : ইজতেমা।**

গত সংখ্যার বিজয়ীদের নাম : ১. ফয়সাল মাহমূদ (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী)। ২. আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী) ৩. মীযানুর রহমান (মোহনপুর, রাজশাহী)।

সংখ্যা প্রতিযোগ ৪/৬:

নির্দেশনা :

খোপের নিচে দেওয়া চারটি সংখ্যা প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম খোপে বসবে। এবার দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ খোপে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলো এমনভাবে বসান, যাতে উত্তরটি অবশ্যই সমান চিহ্নের ডান পাশে দেওয়া সংখ্যাটির সমান হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করতে পারবেন। তবে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলোর মধ্যে কোনটি একাধিকবারও ব্যবহার করা যেতে পারে।

+	−	×✕	÷

							= ৭
১২		৪		২		৩	
							= ৫
৫		২		৩		৮	
							=৮
৮		৪		৩		২	

গত সংখ্যার সংখ্যা প্রতিযোগের উত্তর : (১) ১০✕÷৫×৪ + ১= ৮ (২) ৮×২− ৯−৪=== ৩ (৩) ৯− ৭+২×৩=== ১২

গত সংখ্যায় বিজয়ীদের নাম : ১. মীযানুর রহমান (মোহনপুর, রাজশাহী) ২. মামূনুর রশীদ (কুষ্টিয়া) ৩. অলকা শারমিন (কুষ্টিয়া)।

গত সংখ্যার শব্দজটের উত্তর : পাশাপাশি : ২.জিরাফ ৪. পান ৫. লতা ৭. যব ৮.লাউ ৯. নাজী ১১. নাক ১২. বদর। **উপর-নীচ :** ১. ক্ষীর ২. জিন ৩. ফল ৪. পাবনা ৬. তালাক ১০. জীব ১১. নার ১৩. দই।

গত সংখ্যার শব্দজটে বিজয়ীদের নাম : ১. অলকা শারমিন (কুষ্টিয়া) ২. মীযানুর রহমান (মোহনপুর, রাজশাহী) ৩. ফয়সাল মাহমূদ (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী)।

[উত্তর পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, আই কিউ, তাওহীদের ডাক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২]